ইএফএ গ্লোবাল
মনিটরিং রিপোর্ট

২০০৮

সবার জন্য শিক্ষা

সারসংক্ষেপ

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা আমরা কি সক্ষম হব?

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

অনুবাদ
সালমা আখতার
অধ্যাপক, আই.ই.আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
কাজী আফরোজ জাহানআরা
অধ্যাপক, আই.ই.আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়
ড. কামরুন্নেসা বেগম
প্রাক্তন পরিচালক
আই.ই.আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনেস্কো, ঢাকা
বাড়ী নং ৬৮ (তৃতীয় তলা)
সড়ক ১, ব্লক আই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০-২) ৯৮৬ ২০৭৩
(৮৮০-২) ৯৮৭ ৩২১০
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯৮৭ ১১৫০
ই-মেইল: dhaka@unesco.org

যোগাযোগ
আব্দুর রফিক
ই-মেইল: a.rafique@unesco.org

খান ওয়ালী ইমাম
ই-মেইল: kw.imam@unesco.org

জুন ২০০৮

অনুবাদ এবং পূর্ণ মুদ্রণে: **ইউনেস্কো, ঢাকা**

পূর্ণ-মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
তারকালোক কমপ্লেক্স, ২৫/৩ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ফোন: (৮৮০-২) ৮৬১ ২৮১৯

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা
আমরা কি সক্ষম হব?

সারসংক্ষেপ

ইউনেস্কো প্রকাশনা

Summary
Education for All by 2015
Will We make it?
EFA Global Monitoring Report 2008

এই প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ এবং নীতিবিষয়ক সুপারিশসমূহ কোনভাবেই ইউনেস্কোর মতামতের প্রতিফলন নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইউনেস্কো সম্পাদিত এটি একটি স্বাধীন প্রকাশনা। এই রিপোর্টটি একদল প্রতিবেদক, বহু ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সরকারসমূহের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। এই রিপোর্টে যে মতামত ও ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তার সার্বিক দায়িত্ব পরিচালক গ্রহণ করেছেন।

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত পদবী, বিবরণ কোনভাবেই ইউনেস্কোর মতামত প্রকাশ করে না, বিশেষ করে কোন দেশ, অঞ্চল, শহর বা এলাকা, এর কর্তৃপক্ষ অথবা সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও সীমারেখায় সীমা সংক্রান্ত আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে।

সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনির্টরিং টীম
পরিচালক
নিকোলাস বারনেট
নিকোল বেল্লা, এ্যারন বেনাভোট, মেরিয়েলা বুনোমো, ফাদিলা কেইলয়েড, ভিট্টোরিয়া কাভিচ্চিওনি, এলিসন ক্লেসন, কাথ্যরিন গিনিসটি, সিনথিয়া গাটম্যান, এ্যানা হাস, কিথ হিনসলিফ, এ্যানাস লজিলন, প্যাট্রিক মন্টজোরিডস, ক্লডিন মোকিজোয়া, ডেলফিন সেনজিমানা, উলরিকা পেপলার ব্যারী, পলা রাজকুইন, ইসাবেলা রুলন, ইউসুফ সাঈদ, সুহাদ ভ্যারিন

প্রতিবেদনটি সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে হলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
পরিচালক
সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট টীম
প্রযত্নে: ইউনেস্কো, ৭ প্লেস ডি ফনটেনয়
৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স
ই-মেল: www efareport.unesco.org
টেলিফোন: + ৩৩ ১ ৪৫ ৬৮ ২১ ২৮
ফ্যাক্স : + ৩৩ ১ ৪৫ ৬৮ ৫৬ ২৭
www efareport.unesco.org

পূর্ববর্তী সবার জন্য শিক্ষার গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টসমূহ

২০০৭ সুদৃঢ় ভিত্তি ঃ প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা
২০০৬ জীবনের জন্য সাক্ষরতা
২০০৫ সবার জন্য শিক্ষা-গুণগতমান অত্যাবশ্যক
২০০৩/৪ জেন্ডার এবং সবার জন্য শিক্ষা-সমতার দিকে ধাবমান
২০০২ সবার জন্য শিক্ষা-বিশ্ব কি সঠিক পথে?

ইউনেস্কো কর্তৃক ২০০৭ সনে প্রকাশিত
৭, প্লেস ডি ফনটেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স
গ্রাফিক ডিজাইন: সিলভেইন বেয়েনস
অঙ্গ সজ্জা: সিলভেইন বেয়েনস
ম্যাপস: হেলেন বোরেল
ইউনেস্কো কর্তৃক মুদ্রিত

© ইউনেস্কো ২০০৭
ফ্রান্সে মুদ্রিত
ইডি-২০০৭/WS/৫৫

বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ ঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার মেয়েদের জন্য অধিক অর্জন

বিশ্বব্যাপী ১৯৯৯ সালে যেখানে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৯২ জন মেয়ে ভর্তি হয়েছিল সেখানে ২০০৫ সালে ৯৫ জন মেয়ে ভর্তি হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, উক্ত সময়কালের প্রথমদিকে খারাপ অবস্থায় থাকলেও সর্বোচ্চ ফল অর্জন করেছিল ঃ প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে মেয়েদের সংখ্যা ৮২ থেকে ৯৩ জনে উন্নীত হয়। সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং আরব দেশগুলোতে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির অনুপাতের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি সূচকে শতকরা ৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। এতদসত্ত্বেও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকান, চাদ, আইভরী কোস্ট, গণপ্রজাতন্ত্রী কংগো, নাইজারসহ আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ইয়েমেনে মেয়েদের মোট ভর্তি অনুপাত (GER) ছেলেদের তুলনায় ৮০% বা তার কম ছিল। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, গ্রামাঞ্চল এবং শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য বেশি বা ব্যাপক হওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

সাধারণত মেয়েরা যদি একবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে, ছেলেদের তুলনায় তাদের ভাল ফলাফল করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে কিংবা উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে কোন দেশেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি পুনরাবৃত্তি করে না। সার্বিকভাবে ২০০৪ সালে ৭০টি দেশে মেয়ে ও ছেলেরা সমান অনুপাতে শেষ গ্রেড পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অন্য ৫৩টি দেশে মেয়েদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে। সাব সাহারান আফ্রিকা এবং আরবে অনেক দেশ রয়েছে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ গ্রেডে পৌঁছার ক্ষেত্রে ছেলেদের মত মেয়েদের পক্ষেও জেন্ডার আনুকূল্য দেখা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য

প্রাথমিক স্তরের চেয়ে মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে জেন্ডার পার্থক্য বা বৈষম্য বেশি মাত্রায় বিদ্যমান, এবং অনেক বেশি (চিত্রঃ ২.৪)।

মাধ্যমিক স্তরে ২০০৫ সালে ৬১টি দেশে জেন্ডার পার্থক্য ছেলেদের পক্ষে ছিল, যা ৫৩টি দেশে যেখানে বৈষম্য মেয়েদের অনুকূলে ছিল তার চেয়ে একটু বেশি। শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে ছেলেদের কম পারদর্শিতা একটি উদীয়মান সমস্যা হয়ে দাড়াচ্ছে।

চিত্র ২.৪: অঞ্চলভেদে মাধ্যমিক স্তরে মোট ভর্তির অনুপাতের হারে জেন্ডার পার্থক্যের পরিবর্তনঃ ১৯৯১, ১৯৯৯ ও ২০০৫।

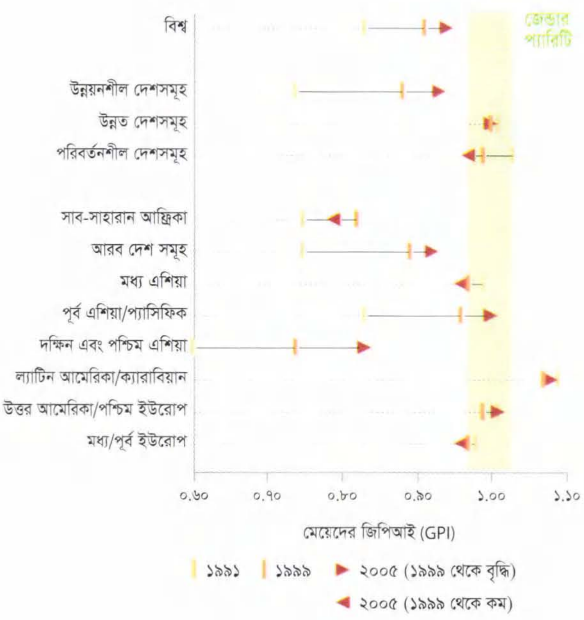

উৎস: অধ্যায় ২: পূর্ণাঙ্গ ইএফএ প্রতিবেদন।

বিশেষ করে এটা শুধু উন্নতদেশগুলোতেই নয় ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানেও তা সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এই একটি মাত্র অঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ছেলেদের তুলনায় বেশি সংখ্যক মেয়েরা ভর্তি হয় [১১টি দেশে প্রতি ১০০ জন মেয়ের বিপরীতে ৯০ জন বা তার চেয়েও কম ছেলে ভর্তি হয়।] স্বল্পতর মেয়াদের একাডেমিক কার্যক্রম যা উচ্চ শিক্ষামুখী নয় তাতে ছেলেদের ভর্তি হওয়ার প্রবণতা বেশি এবং শিক্ষার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তারা জীবিকার জন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণে দারিদ্র্য ছেলেদের জন্য একটি বিরাট বাধা। চিলির একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে দরিদ্র মেয়েদের তুলনায় দরিদ্র ছেলেদের কর্মজীবনে প্রবেশের সম্ভাবনা চারগুণ বেশি।

বিশ্বজুড়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার প্যারিটি সূচক (GPI), ১৯৯৯ এর ০.৯১ থেকে বেড়ে ২০০৫ সালে ০.৯৪ হয়। ১৯৯১ এবং ১৯৯৯ এর মধ্যবর্তী অবস্থার চেয়ে ডাকার ফোরামের পরে বৈষম্য স্বল্প মাত্রায় কমে। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কম ভর্তি হওয়া অঞ্চল হিসাবেই রয়েছে, সবচেয়ে কম মেয়েদের অংশগ্রহণ, প্রতি ১০০ ছেলের বিপরীতে

যথাক্রমে ৮৩ এবং ৭৯ জন মেয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে, সাব-সাহারান আফ্রিকা ১৯৯৯ ও ২০০৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে জেন্ডার প্যারিটি থেকে দূরে সরে আসে। ছেলেদের পক্ষেই হোক আর মেয়েদের পক্ষেই হোক ১৯৯৯ ও ২০০৫ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪৪টির দুই-তৃতীয়াংশ দেশে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস পায়, যা কোন কোন ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার দিকে নিয়ে যায়।

উচ্চ শিক্ষা ঃ প্যারিটি নেই বললেই চলে (Parity is rare)

১৪৪টি দেশের মধ্যে মাত্র চারটি দেশ বতসোয়ানা, চীন, মেক্সিকো এবং পেরু এ পর্যায়ে ২০০৫ সালের মধ্যে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে। বৈশ্বিকভাবে, ২০০৫ সালে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি মহিলা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হয়েছে (গড় জিপিআই ছিল ১.০৫), যা ১৯৯৯ সালের বিপরীত। উন্নত এবং পরিবর্তনশীল (Transition) দেশগুলোতে জেন্ডার বৈষম্য মহিলাদের অনুকূলে অনেক বেশি এবং ১৯৯৯ থেকে এটা আরো বেড়েছে। পুরুষের অনুকূলে বৈষম্য দেখা গিয়েছিল সাব সাহারান আফ্রিকায় (০.৬৮), দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় (০.৭৪), এবং পূর্ব এশিয়ায় (০.৯২)। আরব দেশগুলোতে একই সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হয়েছে, কিন্তু গড় আঞ্চলিক হিসাবে অনেক দেশেই মহিলাদের অংশগ্রহণ অনেক কম যা প্রকাশ করা হয় না।

জেন্ডার সমতা ঃ অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ সুক্ষ্ম এবং কঠিন

শিক্ষারক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমার অর্থ এটা নয় যে নারী এবং পুরুষের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতা অর্জিত হয়েছে। বেতন বৈষম্য, চাকুরি এবং শিক্ষার বিশেষ কোন ক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতে মহিলাদের নিয়োগ বা অভাব থেকে প্রমাণিত হয় যে, জেন্ডার সমতা সর্বত্র অর্জিত হয়নি। সুস্পষ্টভাবে জেন্ডার প্যারিটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু এটা জেন্ডার সমতার জন্য পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার অগ্রগতি সাধনে প্রয়োজন জেন্ডার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার এবং বিদ্যালয়ের কিছু শিখন শর্তাবলীর পরিবর্তন। নিম্নের সব বিষয়গুলো শিক্ষায় জেন্ডার সমতার অগ্রগতি সাধনে সহায়ক।

নিরাপদ এবং জেন্ডার সহায়ক বিদ্যালয় পরিবেশ

এখনও অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিশুদের নিজেদের দ্বারাও শারীরিক এবং মানসিক সহিংস ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ছেলেরাই ঘন ঘন ভীষণভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, বিশেষ করে তারা দৈহিক শাস্তি পায়। মেয়েরা বেশির ভাগ সময়েই যৌন নির্যাতনের এবং হয়রানীর শিকার হয়, যার ফলে তাদের আত্ম-মর্যাদাবোধ কমে যায় এবং শীঘ্রই তারা বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। ঘানা, মালাওয়ি এবং জিম্বাবুয়েতে একটি তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অনেক মেয়ে রিপোর্ট করেছে যে তারা পুরুষ শিক্ষক এবং তাদের চেয়ে বয়সে বড় পুরুষ শিক্ষার্থী কর্তৃক যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত সুবিধার অভাবে কমবয়স্ক মেয়েরা, বিশেষ করে বয়:সন্ধিকালের পরবর্তী সময়ে শ্রেণীতে প্রায়ই অনুপস্থিত থকে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের যে সকল মেয়েরা বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে, তার অর্ধেকেরই ঝরে পড়ার কারণ হলো পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব।

মহিলা শিক্ষক এবং শ্রেণীকক্ষের গতিশীলতা

যেসব দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকদের হার বেশি, সেসব দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে জেন্ডার প্যারিটি বেশি দেখা যায়। বৈশ্বিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের হার ৯৪%, কিন্তু এ হার কমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়েছে ৬২%, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫৩% এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হয়েছে ৪১%। যাই হোক, শুধু মহিলা শিক্ষকদের উপস্থিতি দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে মেয়ে এবং ছেলেরা বিদ্যালয়ে সম আচরণ পাবে।

অনেক শিক্ষকই দাবি করেন যে তারা ছেলে এবং মেয়েদের প্রতি সমআচরণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের মনোভাবে সুক্ষ পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা সমালোচনা, প্রশংসা এবং গঠনমূলক ফলাবর্তনের (feedback) মাধ্যমে শিক্ষকদের সাথে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) সুযোগ পায় এবং শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যাবলীতে তাদের অংশগ্রহণও বেশি। কেনিয়া, মালাওয়ি এবং রুয়ান্ডার গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের ওপর এক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকদের প্রত্যাশা কম। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের অংশগ্রহণের নমুনা (pattern) থেকে বোঝা যায় যে, খুব কম সংখ্যক মেয়েই শ্রেণীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

কীভাবে জেন্ডার, নিজেদের অভিন্নতা রক্ষা করে এবং শিক্ষার্থীদের মনোভাব, প্রত্যক্ষণ এবং প্রত্যাশার স্বীকৃতি প্রদানস্বরূপ তাদের পারস্পরিকভাবে সক্রিয় করে, তা বোঝার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ তুলনামূলকভাবে এখনও পর্যাপ্ত নয়।

শিখন সামগ্রীর উপাদানে পক্ষপাতিত্ব

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কোন পর্যায়ের শিক্ষায়, শিক্ষা বিষয়ে দেশ বা অঞ্চলে মেয়েদের এবং মহিলাদের বিপরীতে জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে এখনও মেয়েদের এবং মহিলাদের ভূমিকাকে গতানুগতিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এমনকি যে সব দেশ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে সেখানেও এটা দেখা যায়। চীনের সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে পুরুষদের দেখানো হয়েছে বিজ্ঞানীদের প্রতিকৃতিতে এবং মহিলাদের শিক্ষক হিসেবে। ক্যামেরুন, আইভরী কোস্ট, টোগো এবং তিউনিসিয়ার মতো প্রত্যেকটি দেশে গণিত বিষয়ের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বিষয়বস্তুর মধ্যে মাত্র ৩০% এরও নিচে মহিলা চরিত্র দেখানো হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকগুলোতে জেন্ডার সমতা উন্নয়নের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে দেখা গিয়েছে যে, বর্তমান দশকগুলোতেও মহিলাদের ভূমিকা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। প্রধানত এইচ.আই.ভি. এবং এইডসের জন্য জেন্ডার প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্রম বিষয় হিসেবে যৌন শিক্ষা বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মহিলাদের যৌন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে, ছেলেদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার জন্য অনেক দেশেই এ ধরনের কার্যক্রম সমালোচিত হচ্ছে। বতসোয়ানায় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যৌন শিক্ষার বিষয়ে একটি গবেষণার ফলাফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উভয়ের আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে ছেলে এবং মেয়েদের সামাজিক গতানুগতিক ভূমিকাই প্রাধান্য পায়। শিক্ষকরা মেয়েদের বিষয়ে যে সকল উদাহরণ প্রদান করেন তাতে মেয়েদেরকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যান এবং এগুলো ছেলেদের অভিজ্ঞতা এবং সেক্স সংক্রান্ত বিষয়ে আকর্ষণ করে।

পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভাল অর্জিন, গণিতেও ভাল অগ্রগতি

বৃহৎ আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিকভাবে মূল্যায়নকৃত তথ্য থেকে তিনটি প্রধান বিষয় যেমন ভাষা, গণিত এবং বিজ্ঞানের পয়েন্ট অর্জনের গতি তুলে ধরা যায়।

প্রথমত মেয়েরা সন্দেহাতীতভাবে ভাষার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় ভাল পারদর্শিতা প্রদর্শন করে, এমনকি যে সব দেশে ভর্তির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে জেন্ডার বৈষম্য রয়েছে সেখানেও তারা ভাল করে, যেমন অনেক আরব দেশে এটা হয়।

দ্বিতীয়ত গড়ে মেয়েরাও ছেলেদের সাথে সাথে গণিতের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। অতি সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি দেশে পার্থক্যটা মেয়েদের অনুকূলে পরিলক্ষিত হয় (উদাহরণস্বরূপ, আর্মেনিয়া, ফিলিপাইন, মলডোভা প্রজাতন্ত্র)। তৃতীয়ত ছেলেরা বিজ্ঞান বিষয়ে যখন ভাল অবস্থানে রয়েছে, তখন মেয়েরাও এগিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা এখনও পিছিয়ে আছে। বেশিরভাগ দেশের তথ্যে দেখা যায় যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়সমূহে এক-তৃতীয়াংশেরও কম মেয়ে শিক্ষার্থী, কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানববিদ্যায়, সামাজিক বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ক্ষেত্রসমূহে রয়েছে। ইটালি ছাড়া সমস্ত OECD দেশসমূহে, গবেষণার যোগ্যতায় মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এগিয়ে।

পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে এখনও মেয়েদের এবং মহিলাদের ভূমিকাকে গতানুগতিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়।

সবার জন্য শিক্ষায় সার্বিক অগ্রগতি

২০০৩ সালে শিক্ষার উন্নয়ন সূচক (EDI) প্রবর্তন করা হয়, যা সবার জন্য শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (UPE), বয়স্ক সাক্ষরতা, জেন্ডার এবং শিক্ষার গুণগত মান[৫]। এ বৎসর ১২৯টি দেশের সূচক দেখানো হয়েছে। (বক্স ২.২)। এগুলোর মধ্যে অনেক দেশকে বাদ রাখা হয়েছে। কারণ শিক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে এসব রাষ্ট্রের চিত্র বেশ নাজুক।

৫. প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য প্রতিনিধিত্বমূলক সূচক দ্বারা নির্দেশিত। UPE এর জন্য এটি প্রাথমিক স্তরে মোট নেট ভর্তি অনুপাত (NER), বয়স্ক সাক্ষরতার জন্য ১৫ বৎসর এবং তদুর্ধ মানুষের সাক্ষরতার হার, জেন্ডার প্যারিটি (parity) এবং সমতার (equality) জন্য জেন্ডার সুনির্দিষ্ট EFA সূচক, মানসম্মত শিক্ষার জন্য ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকার হার। শিক্ষার উন্নয়ন সূচক (EDI) ০ এবং ১ এর মধ্যে হেরফের করে, সবার জন্য শিক্ষার (EFA) পরিপূর্ণ অর্জনকে ১ দ্বারা সূচিত করা হয়।

১৯৯৯ এবং ২০০৫ এই উভয় সনেই তথ্য রয়েছে এমন চুয়াল্লিশটি দেশের মধ্যে বত্রিশটি দেশের EDI সূচক গড়ে ৩.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইথিওপিয়া, গুয়েতেমালা, লেসোথো, মোজাম্বিক, নেপাল, ইয়েমেন যেসব স্থানে ১৯৯৯ এবং ২০০৫ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, এসব দেশে ইডিআই সূচক ১০% এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। গুয়েতেমালা ছাড়া এ সকল দেশের ইডিআই সূচকের মান অনেক কম, কিন্তু দ্রুত EFA অর্জনের দিকে ধাবমান। অন্যদিকে বারটি দেশে ইডিআই এর মান একটু কমেছে (২% অথবা তার ওপর)। দেশগুলো হচ্ছে- চাদ, লিথুয়ানিয়া এবং গণপ্রজাতন্ত্রী মলডোভা।

সার্বিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট ভর্তির হার (NER) বৃদ্ধি পাওয়াতে ইডিআই সূচকের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশির ভাগ দেশে যেখানে ইডিআই সূচক একটু বৃদ্ধি পেয়েছে বা একটু হ্রাস পেয়েছে সেখানে দুর্বল পয়েন্ট ছিল পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের টিকে থাকার হার।

বক্স ২.২: EDI (ইডিআই) এর ফলাফল

- একান্নটি দেশের (মোট নমুনার ৪০% এর মত) ইডিআই এর মান ০.৯৫ অথবা এর ওপরে। এসব দেশের বেশির ভাগই উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে, কিন্তু এই উচ্চ সাফল্য অর্জনকারী শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া ব্যতীত সকল অঞ্চলের দেশসমূহ রয়েছে। এ সকল দেশসমূহে শিক্ষার অধিকার বাগড়ম্বরপূর্ণতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এসব দেশে কয়েক দশক ধরে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে অবৈতনিক।
- মোট আটটি EFA অঞ্চলের মধ্যে তিপান্নটি দেশে, ইডিআই এর মূল্যমান ০.৮০ থেকে ০.৯৪ এর মধ্যে রয়েছে। এ দলভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্রায়ই প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার অনেক বেশি হলেও নিম্নমানের শিক্ষা এবং বয়স্ক সাক্ষরতার গুণগত মান অনেক কম বিধায় অথবা উভয়ের কারণে এর EDI এর মূল্যমান কমে যায়।
- পঁচিশটি দেশ (যেসব দেশ EDI এর হিসাবের জন্য ধরা হয়েছে সে সবের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ) এখনও EFA এর সাফল্য অর্জন থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এসব দেশের ইডিআই মান ০.৮০ এর কম। এগুলোর মধ্যে আটটি* রাষ্ট্রের অবস্থা বেশ নাজুক। পঁচিশটি দেশের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশই আফ্রিকার সাব সাহারান অঞ্চলে অবস্থিত এবং এদের অনেকগুলোর EDI মান ০.৬০ এর নিচে। এই দলের মধ্যে চারটি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান), নয়টি উচ্চ জন অধ্যুষিত দেশের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর বেশির ভাগ দেশেই চারটি EFA লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাপ্ত সূচকের মান অনেক কম রয়েছে।

* *বুরুন্ডি, চাদ, ইরিত্রিয়া, গিনি, গণপ্রজাতন্ত্রী লাও, নাইজার, নাইজেরিয়া এবং টোগো*

সুশীল সমাজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

কম উন্নত দেশসমূহে ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যের অগ্রগতি

চৌদ্দটি দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফ করা হয়েছে।

দরিদ্র পরিবারসমূহের খরচ কমানো হয়েছে

অধ্যায় ৩: অগ্রসরমান দেশসমূহ

মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা

গুণগত মান বৃদ্ধি করা: বিস্তারিত পরিকল্পনার প্রয়োজন

একীভূত শিখন সুযোগ

শিক্ষক স্বল্পতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কৌশল অবলম্বন

এই অধ্যায়ে তিনটি নীতিমালার ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, দেশসমূহ কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত এবং জোরদার করছে, যার ফলে সকল শিশু, যুবক এবং বয়স্কদের শিখন চাহিদা মেটানো যায় ঃ শিক্ষাকে সহায়তাদান ও উন্নত করার জন্য একটি ইনস্টিটিউশনভিত্তিক পরিবেশ, বিশেষ করে সবচাইতে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত করা, এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলীকে উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ। নীতিমালা পর্যালোচনার মাধ্যমে এবং ২০০০ সাল থেকে প্রধানত উন্নয়নশীল ত্রিশটি দেশের একটি নির্বাচিত দল যেসব পলিসি এবং কৌশল অবলম্বন করেছিল তা পর্যালোচনা করায় এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

শিক্ষা নীতিমালার একটি অনুকূল পরিবেশ

পরিকল্পনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া

২০০০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষা সেক্টর পরিকল্পনার সরকারি প্রচেষ্টার গতি বৃদ্ধি হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে ত্রিশটি দেশের বেশির ভাগেরই এখন শিক্ষা পরিকল্পনা রয়েছে। তারা ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষার প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, এর গুণগতমান এবং ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সম্প্রতি EFA-এর দ্রুতলয়ে উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পর্যালোচনার জন্য একটি পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে যাতে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। যাহোক, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা বেশ দুর্বল এবং এক্ষেত্রে পুরো অর্থের বিনিময়ে পরিকল্পনার অর্ধেকেরও কম বিষয় মধ্যবর্তী অর্থসংক্রান্ত কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক শিক্ষা পরিবীক্ষণের জন্য উন্নত জাতীয় সামর্থ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। সকল অঞ্চলের অনেক দেশই (যেমন, মেক্সিকো, মরক্কো, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইনস এবং ইয়েমেন) শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যাহোক, অনেক নিম্ন আয়ের দেশসমূহে শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হলো ব্যবস্থাপনার ধারণক্ষমতার দুর্বলতা অব্যাহত থাকা। উদাহরণ-স্বরূপ, বুরকিনা ফাসো, যেখানে মৌলিক শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটেছে, তবু পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক এবং শিখন সামগ্রী এ সব কিছুর ব্যবস্থা করা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। শিক্ষার প্রসারণ এবং গুণগত মান উন্নয়নের জন্য স্টাফদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সংগঠিত কাঠামো (Organizationjal Structure) উভয়ের প্রতিই সচেতনতা বৃদ্ধির বেশ গুরুত্ব রয়েছে।

সুশীল সমাজ : দৃঢ় প্রবক্তা

ডাকার সম্মেলনের পর থেকে সুশীল সমাজ, দৃঢ় প্রবক্তা হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা সেক্টরের নীতিমালা প্রণয়নে সরকার এবং সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহের (CSOs) ভূমিকা গতানুগতিক থেকে ভিন্ন। শিক্ষার জন্য ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বিক প্রচারনা অভিযান, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং

শিক্ষার জন্য ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বিক প্রচারনা অভিযান, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী প্রচারনা নেটওয়ার্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়সমূহকে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য সক্ষম করে তোলা।

বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী প্রচারনা নেটওয়ার্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সুশীল সমাজের প্রেক্ষাপট এবং প্রস্তাবসমূহ জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব ফেলে। কিন্তু সুসংগঠিতভাবে এজেন্ডা নির্ধারণের এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই সুযোগগুলো সীমিত থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় সরকার নীতিমালার সংলাপে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ সীমিত করার চেষ্টা করে। তথাপি, একটি প্রসারিত ভূমিকার জন্য সুশীল সমাজ সংস্থাগুলো (CSOs) নতুন নতুন সুযোগ খোঁজে। কেউ কেউ শিক্ষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন করে (উদাহরণস্বরূপ, Action Aid এর কাজে বয়স্কদের সাক্ষরতা প্রদানের পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটে) এবং অন্যরা কমিউনিটিগুলোকে বাজেট সংগ্রহে এবং বিকল্প পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, ল্যাটিন আমেরিকা শিক্ষাকর্মকে উজ্জীবিত করার জন্য PREAL* কয়েকটি দেশে শিক্ষার উপর রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করে। তাদের প্রকাশনা প্রায়ই প্রাণবন্ত জাতীয় বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং সরকারগুলোকে জনসমক্ষে তাদের নিজস্ব প্রকাশিত রিপোর্টের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উৎসাহিত করে।

বেসরকারি বিনিয়োগকারী

অনেক আফ্রিকান সাব-সাহারান দেশে যেখানে ২০০০ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে বেসরকারি ব্যবস্থাপকগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশগুলোও প্রাথমিক শিক্ষায় বিরাট একটি

* *Partnership for Educational Revitalization*

প্রত্যন্ত অঞ্চলের সম্প্রদায়ের নিকট পৌছানো : ব্রাজিলে একটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় (নদীর মোহনায়) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষা ই.এফ.এর লক্ষ্যের সাথে প্রাসংগিকভাবেই যুক্ত বিশেষ করে জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত লক্ষ্য এবং শিক্ষক ও প্রশাসকদের যোগদানকারী উপাদান হিসাবে। বিশ্বজুড়ে ২০০৫ সালে প্রায় ১৩৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হয়েছিল যা ১৯৯৯ এর চেয়ে ৪৫ মিলিয়ন বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেমন ব্রাজিল, চীন, ভারত এবং নাইরেজিয়ার উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভাবে ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যা হোক, তুলনামূলকভাবে এ বয়সী জনগোষ্ঠীর ছোট একটি অংশেরই উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। সারা বিশ্বে ২০০৫ এ উচ্চ শিক্ষায় জিইআর ছিল ২৪% এর কাছাকাছি। অঞ্চলভেদে এই অংশগ্রহণের অনুপাতে ব্যাপক পার্থক্য ছিল যেমন, সাব-সাহারান আফ্রিকার ৫%, দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়াতে ছিল ১১%, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে ছিল এই হার ৭০%।

লক্ষ্য ৩: যুব সম্প্রদায় এবং বয়স্কদের শিখন চাহিদা পূরণ/মেটান

'যথাযথ শিখন এবং জীবন- দক্ষতাভিত্তিক কার্যক্রমে সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগের মাধ্যমে সব যুব এবং বয়স্কদের শিখন চাহিদা পূরণ নিশ্চিতকরণ।'

দেশীয় সরকারগুলো প্রধানত আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে তরুন এবং বয়স্কদের শিখন চাহিদা পূরনের ব্যবস্থা করেছে। যাহোক, মানুষ কিন্তু অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও দক্ষতা অর্জন করে। ন্যায্যতার প্রেক্ষাপট থেকে এই সব শিখন কার্যাবলী মনোযোগ পাওয়ার দাবিদার। কারণ এসব কার্যক্রম অসুবিধাগ্রস্ত তরুন এবং বয়স্কদের জন্য পরিচালনা করা হয় যেখানে অনেক শিশুরাই বিদ্যালয়ে যায় না কিংবা মৌলিক দক্ষতা অর্জন ছাড়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে থাকে, তাদের জন্য এসব কার্যক্রম অনেক কাজে আসে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলোতে অনেক বেশি বিভিন্নতা থাকে এবং একাধিক মন্ত্রণালয় কিংবা সরকারি সংস্থাগুলো তা দেখাশুনা করে থাকে। অনেক দেশেই বেসরকারি সংস্থাগুলোর (NGOs) ছোট আকারের উদ্যোগ/কার্যক্রম এক্ষেত্রে প্রধান হিসাবে দেখা যার। জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চাহিদা ও যোগানের উন্নত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে যেহেতু অনেক ধরনের শিখন কার্যক্রম চলে, তাই কি মাত্রায় চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে যোগান দেওয়া হয় তা বেশির ভাগ অজানাই থেকে যায়। ২০০৮ এর প্রতিবেদনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে ৩০টি দেশের কাজের অভিজ্ঞতার তথ্য রয়েছে। খানাভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে দেখা যায় যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পৃথিবীর কিছু দরিদ্রতম দেশগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত তরুণ এবং বয়স্কদের শেখার প্রধান উপায় বা মাধ্যম।

জীবন দক্ষতাবলী (স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার) এবং জীবিকার্জন (আয় বাড়ান, কৃষি) সম্বলিত বড় মাপের সাক্ষরতা কর্মসূচি/কার্যক্রম প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, বিশেষ করে আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, নেপাল, সেনেগালের মত দরিদ্র দেশগুলোতে। এই দেশগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বহি:সাহায্য থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। সমতুল্যতা অথবা "দ্বিতীয় সুযোগ" এর সেবা অনেক সময় সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় যা যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়ার একটি পরিচিত মাধ্যম হিসাবে কাজ করে থাকে (যেমন- ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, ফিলিপাইন্স, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম)। অন্য দেশগুলোর জাতীয় কার্যক্রমে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে দক্ষতার উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়- চীন, মিশর, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভিয়েতনাম এর অন্তর্ভুক্ত। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে গ্রাম-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলীতে প্রাধান্য দেয়া হয় ব্রাজিল, বুরকিনা-ফাসো, চীন, ইথিওপিয়া, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইন্স ও থাইল্যান্ডে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলো প্রায়ই স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত থাকে। এশিয়ার অনেক দেশেই কম্যুনিটি লার্নিং সেন্টারগুলো (যেমন থাইল্যান্ডে ৮০০০ এর বেশি আছে) স্থানীয় চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা এবং দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ এসবের ওপর ব্যাপকভাবে কাঠামোবদ্ধ শিখন কার্যাবলীর ব্যবস্থা করে থাকে।

খানা ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে দেখা যায় যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পৃথিবীর কিছু দরিদ্রতম দেশগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত তরুণ এবং বয়স্কদের শেখার প্রধান উপায় বা মাধ্যম।

লক্ষ্য ৪: সাক্ষরতা এবং সাক্ষর পরিবেশ : প্রয়োজনীয় কিন্তু নাগালের বাইরে (Elusive)

'বয়স্ক সাক্ষরতা, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে ৫০% অর্জন এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সকল বয়স্কদের সমভাবে প্রবেশের সুযোগ প্রদান।'

সাক্ষরতা একটি মৌলিক মানবাধিকার, কেবল সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের একটি ভিত্তি নয়, ব্যাপক অর্থে দারিদ্র্য

দূরীকরণ এবং সমাজে অংশগ্রহণের মাত্রা ও পরিধি বাড়িয়ে থাকে। তথাপি সারা বিশ্বে প্রায় ৭৭৪ মিলিয়ন নিরক্ষর বয়স্ক লোক রয়েছে যাদের ৬৪% মহিলা। এই সংখ্যা সাধারণত আদমশুমারী অথবা খানা জরিপ থেকে নেয়া যা পরোক্ষ গণনা/পরিমাপের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ/সরাসরি পরিমাপের যেসব প্রমাণাদি রয়েছে তাতে দেখা যায় যে সাক্ষরতার বহুবিধ চ্যালেঞ্জ প্রকৃত অর্থে অনেক ব্যাপক, কেনিয়ার সাম্প্রতিক এক জরিপ তার উদাহরণ (বক্স: ২.১)।

১৯৮৫-১৯৯৪ এবং ১৯৯৫-২০০৪ এর মধ্যবর্তী সময়গুলোতে বিশ্বের বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৭৬% থেকে ৮২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই বৃদ্ধি বেশি লক্ষণীয় (৬৮% থেকে ৭৭%)। আরব দেশগুলো এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে সবচেয়ে টেকসই অগ্রগতি হয়েছিল। প্রত্যেকটি দেশে ১২% পয়েন্ট বৃদ্ধি হয়েছিল। ক্রমাণত উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঐসব অঞ্চল এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে নিরক্ষর বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমাগত হারে কমে নাই। গড় বিশ্বহারের চেয়ে বয়স্ক সাক্ষরতার হার কম রয়েছে যেসব দেশে ঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায়, সাব-সাহারান আফ্রিকায় (প্রতিটিতে ৫৯%) এবং আরব দেশগুলো ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে (প্রতিটিতে ৭১%)। বিশ্বের নিরক্ষরদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি বাস করে মাত্র ১৫টি দেশে-এর মধ্যে ৯টি উচ্চ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের ৮টি দেশ রয়েছে (ই-৯) ঃ বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান।

পনেরটি দেশের মধ্যে অধিকাংশ দেশে ১৯৮৫-১৯৯৪ এই সময়ের পর বয়স্ক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও অব্যাহতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কয়েকটি দেশে নিরক্ষরদের absolute সংখ্যা বেড়েছে (বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, মরক্কো)। দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার কয়েকটি দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৫০% এর নিচে বিরাজমান (মানচিত্র ২.২)।

চীনে বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা হঠাৎ করে খুব কমেছিল, ৯৮ মিলিয়নের মত, যা প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলোর বয়স্ক সাক্ষরতা গড় হারের বৃদ্ধির কারণ বুঝায়। অব্যাহতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দলের উদ্দেশ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং সাক্ষর পরিবেশের উন্নয়নের জন্য চীনে এই সফলতা অর্জিত হয়েছে। এ ধরনের পরিবেশ যা জনজীবন এবং ব্যক্তি জীবনে দেখা যায় এবং যেখানে লিখিত সামগ্রী (সংবাদপত্র, বই, পোষ্টার), ব্রডকাষ্ট মিডিয়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) সাক্ষরতার দক্ষতা আয়ত্ব করতে এবং কাজে লাগাতে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

বক্স ২.১: কেনিয়ার জাতীয় বয়স্ক সাক্ষরতা জরিপ

কেনিয়া ২০০৬ সালে প্রত্যক্ষ পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৫০০০ খানার ওপর জাতীয় বয়স্ক সাক্ষরতা জরিপ করেছিল। জরিপের পরিমাপ অনুযায়ী বয়স্ক সাক্ষরতার হার হয়েছিল ৬২%, যা ২০০০ সনের বহু সূচকভিত্তিক ক্লাস্টার সার্ভের (Multiple Indicators Cluster Survey) স্ব-পরিমাপকৃত ৭৪% এর চেয়ে অনেক কম। গ্রেড-৪ এবং গ্রেড-৫ এর মাঝে টার্নিং পয়েন্ট ধরে সাক্ষরতা ও গণনার দক্ষতায় জেলা, বয়স ও যে পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে তার ভিত্তিতে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়, যেসব বয়স্করা গ্রেড-৪ কিংবা তার নিচের পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেছিল তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ২০% এর নিচে এবং যারা গ্রেড-৫ কিংবা তার ওপরের শ্রেণীতে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিল তাদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬৫% এর বেশি। জরিপে অনেক উত্তরদাতা বলেছিল যে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর দূরত্ব এবং শিক্ষকের অভাবের কারণে তারা সাক্ষরতার ক্লাশগুলোতে যোগদান করেনি কিংবা শিক্ষাকেন্দ্র পরিত্যাগ করেছিল। এই জাতীয় প্রত্যক্ষ পরিমাপ সাক্ষরতার তথ্য ও উপাত্তের মান বৃদ্ধি করে, প্রচলিত কার্যক্রম পরিমাপের জন্য সঠিক তথ্য যোগায় যা যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণে সহায়ক।

যুব সাক্ষরতার হার (১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে) সব অঞ্চলেই দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে আরব দেশ এবং পূর্ব এশিয়ায় যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তরুণ প্রজন্মের প্রবেশ ও অংশগ্রহণের ভাল সুযোগ বুঝায়। প্রায় সব অঞ্চলেই এই বৃদ্ধির সঙ্গে নিরক্ষরদের সংখ্যা কমে যাওয়ার সম্পর্ক দেখা যায়। যদিও সাব-সাহারান আফ্রিকাতে যুব/তরুনদের সাক্ষরতার হার ৯% বৃদ্ধি পায়, তথাপি এই অঞ্চলে ক্রমাগত বর্ধিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্কুল সমাপ্তিকারীদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে ৫ মিলিয়ন অতিরিক্ত যুব/তরুণ নিরক্ষর রয়েছে।

সাক্ষরতা এবং ন্যায্যতা (Equity)

সারাবিশ্বে প্রতি ১০০ জন সাক্ষর পুরুষের বিপরীতে ৮৯ জন সাক্ষর মহিলা রয়েছেন। ১৯৮৫-১৯৯৮ সময়ের মধ্যে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (প্রতি ১০০ জন সাক্ষর পুরুষের বিপরীতে ৬৭ জন মহিলা), আরব দেশগুলোতে (৭৪ জন) এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে (৭৬ জন) পার্থক্য বিরাজমান।

মানচিত্র ২.২: বয়স্ক সাক্ষরতা এবং নিরক্ষরদের সংখ্যা ঃ ১৯৯৫-২০০৪

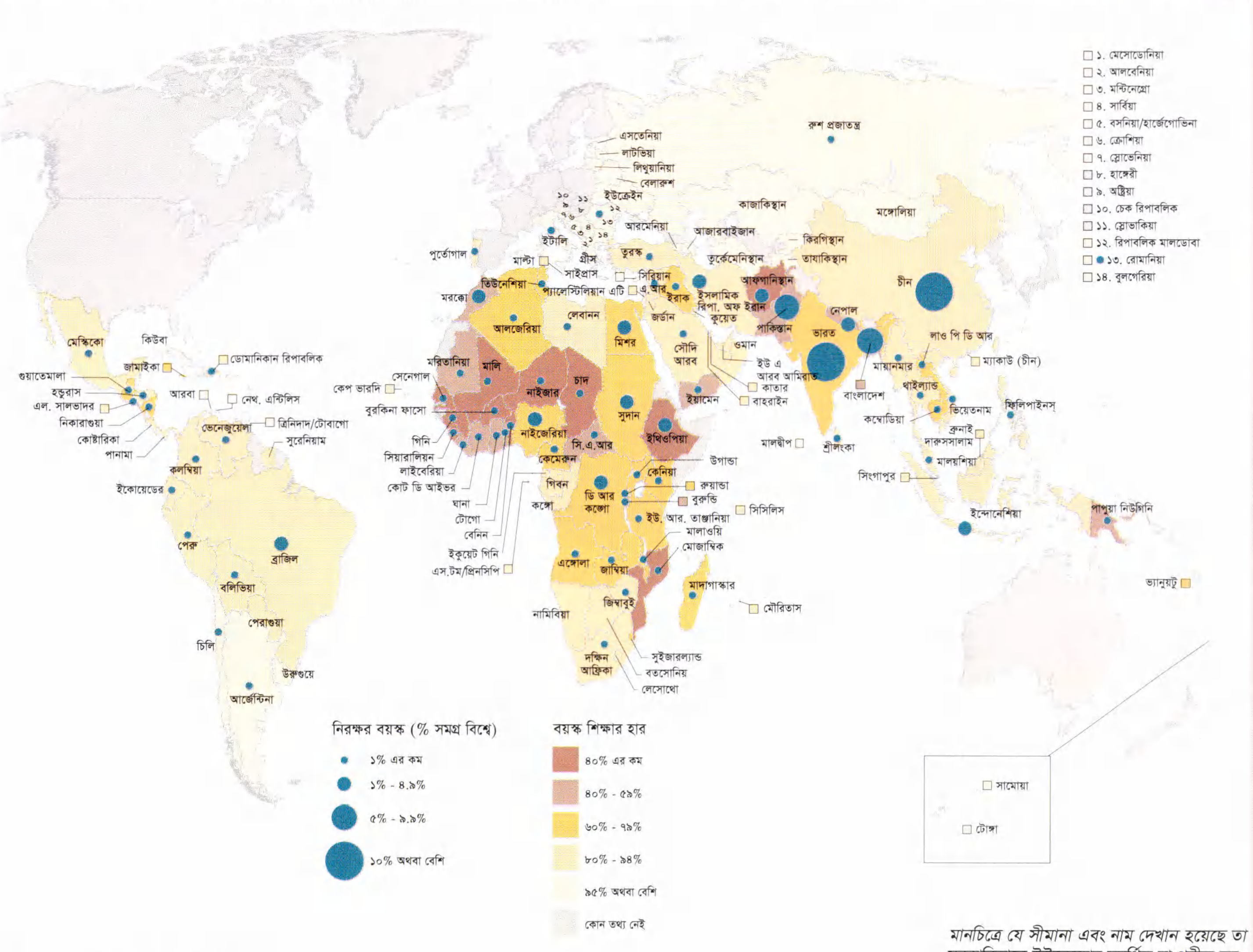

উৎসঃ অধ্যায়-২ঃ পূর্ণাঙ্গ ইএফএ প্রতিবেদন।

মানচিত্রে যে সীমানা এবং নাম দেখান হয়েছে তা সরকারিভাবে ইউনেস্কোর সমর্থিত বা গৃহীত নয়। জাতিসংঘের মানচিত্র ভিত্তিক।

সর্বোপরি, চরম দরিদ্র দেশগুলোতে নিরক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি। পরিবার পর্যায় পর্যন্ত এ যোগসূত্র বিদ্যমান বা বিস্তৃত। সাধারণভাবে বলা যায় যে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে কিছু কিছু জনগোষ্ঠী যেমন স্থানান্তরী (migrants), আদিবাসী গোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচিতে প্রবেশ কম হয়ে থাকে।

লক্ষ্য ৬: গুণগতমান ঃ শিশুরা কতটুকু শিখছে?

"শিক্ষার গুণগত মানের সর্বক্ষেত্রেই মান বৃদ্ধি এবং সর্বক্ষেত্রেরই উৎকর্ষতা সাধন নিশ্চিতকরণ যাতে সকলেই স্বীকৃত এবং পরিমাপযোগ্য শিখনফল, বিশেষ করে সাক্ষরতা, গণনা এবং আবশ্যকীয় জীবনদক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারে।"

গুণগতমান শিক্ষার হৃদপিন্ডে অবস্থিত। শিশুদের যখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিখন সামগ্রী, শেখানোর সময় এবং পর্যাপ্ত বিদ্যালয় সুবিধাদির স্বল্পতা থাকে, তাদের পক্ষে মৌলিক শিখনদক্ষতা আয়ত্ব করা সম্ভব হয় না। এই প্রতিবেদনে গুণগত মানকে শিখনফল, শিখন অবস্থা এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিখন ফলাফল: নিম্নমানের অর্জন ব্যাপক

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মূল্যায়নগুলোতে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশের শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের অর্জনের প্রমাণ মেলে। উদাহরণস্বরূপ, পিসা (PISA)[২]

চরম দরিদ্র দেশগুলোতে নিরক্ষরতা সবচেয়ে বেশি, পরিবার পর্যায় পর্যন্ত এ যোগসূত্র বিদ্যমান।

২. *প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট*

২০০৩ পঠন মূল্যায়নে দেখা যায় যে কিছু ওইসিডি দেশের ১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ২০% (বা তার বেশি) এর পঠনদক্ষতা নিম্নতম মানের অথবা আরো নিচে। ২০০১ এর পি.আই.আর.এল.এস (PIRLS)[৩] মূল্যায়ণে দেখা যায় যে অনেক দেশে আর্জেন্টিনা, কলাম্বিয়া, ইরান, কুয়েত, মরক্কো এবং তুরস্কের চতুর্থ গ্রেডের ৪০% শিক্ষার্থীর পঠনদক্ষতা অনেক কম কিংবা অত্যন্ত নিম্নমানের। এসব মূল্যায়ন ও পরিমাপ দেশগুলোর ভেতরেই শিখনফল অর্জনে বৈষম্য বা পার্থক্যকে নির্দেশ করে থাকে। উচ্চতর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের (পিতামাতার শিক্ষা, চাকুরি, পারিবারিক সম্পদ) সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা অর্জনের ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মূল্যায়ন/পরিমাপগুলো শহরের শিক্ষার্থীদের পক্ষে পার্থক্য নির্দেশ করে, যাতে শহরের পরিবারগুলোর বেশি আয় এবং উন্নত স্কুল সুবিধাদির প্রতিফলন দেখা যায়। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে দেখানো হয়েছে যে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় কিংবা কার্যক্রমে অর্জনের যে পার্থক্য রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আফ্রিকার অনেক দেশের ২৫% থেকে ৪০% শিক্ষক বলেছেন যে তাদের কোন বিষয়ভিত্তিক বই কিংবা গাইড বই নেই।

অনেক দেশের সরকারই জাতীয় শিখনফল অর্জন বিষয়ে মূল্যায়ন বা পরিমাপ শুরু করেছে কিংবা চালিয়ে যাচ্ছে ঃ ২০০০-২০০৬ সালে ৮১% উন্নত দেশে, ৫০% উন্নয়নশীল দেশে এবং ১৭% পরিবর্তনশীল দেশে এই মূল্যায়ন কার্যক্রম কমপক্ষে একবার করে পরিচালনা করা হয়েছে যা তুলনামূলকভাবে ১৯৯৫-১৯৯৯ থেকে অনেক বেশি। জাতীয় পরিমাপগুলোতে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে সরকারি ভাষা ও গণিতে শিখনফল অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই ধারা শিক্ষার মান সংক্রান্ত বিষয়ে সময়োপযোগী তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় সরকারগুলোর দৃঢ় প্রচেষ্টা বোঝায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের অংশ হিসেবে মরক্কো ২০০৬ সনে মূল্যায়ণ পরিচালনা করেছিল। আরবি, ফরাসি এবং গণিতে অর্ধেকেরও কম শিক্ষার্থী ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করেছিল। হাইতি ২০০৪/০৫-এ যে মূল্যায়ণ করে তাতে গ্রেড-৪ এ মাত্র ৪৪% শিক্ষার্থী প্রত্যাশা বা মান পূরণ করেছিল। ষোলটি দেশের পূর্বের এবং সাম্প্রতিককালের পরিচালিত জাতীয় পরিমাপে প্রাপ্ত গড় অর্জনের তুলনা করলে উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়। বেশির ভাগ দেশেই তথ্যানুযায়ী গ্রামের শিশুরা ভাষা এবং গণিতে শহরের শিশুদের চেয়ে কম নম্বর পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়েই হোক কিংবা বাড়িতেই হোক বিষয়বস্তু শেখার জন্য প্রকৃতপক্ষে কতখানি সময় ব্যয় করা হয় তা কৃতিত্ব অর্জনকে প্রভাবিত করে থাকে, বিশেষ করে ভাষা, গণিত এর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। সর্বোপরি দেশগুলো আশা করে যে সব বিদ্যালয়ে গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৬ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখনে মোট ৪৬০০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করা উচিত। অনেক অঞ্চলেই পর্যাপ্ত সময়ের নীতিমালা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সময় পায় না। কয়েকটি আরব দেশে হিসাব করে দেখা যায় যে গড়ে সত্যিকার শিখন সময় নির্ধারিত সময় থেকে ৩০% কম। পরিস্থিতি থেকে দেখা যায় যে শিক্ষক অনুপস্থিতি, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, ধর্মঘট, সশ্রস্ত্র সংঘাত, ভোট গ্রহণের কেন্দ্র কিংবা পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে স্কুলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শিক্ষার্থীদের শিখন-সময় কমিয়ে দেয়।

শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর পাঠ্যপুস্তকের ধনাত্মক প্রভাব রয়েছে, এবং বিশেষ করে অল্প আয়ের পরিস্থিতিতে এবং আর্থ-সামাজিক অসুবিধাকে পাঠ্যপুস্তক উৎরে দিতে পারে। উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ করে দরিদ্র এবং গ্রামের স্কুলের অনেক শ্রেণীকক্ষে মাত্র একটি পাঠ্যবই দেখা যায়। তাও সেটা কেবল শিক্ষকের হাতেই থাকে। শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগ সময়ই ব্যয় করে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে নোটবুকে কপি করতে এবং তা মুখস্থ করতে। আফ্রিকার অনেক দেশেই ২৫% থেকে ৪০% শিক্ষক বলেন যে, তারা যে বিষয় পড়ান তার জন্য কোন বই কিংবা নির্দেশিকা/গাইড তাদের হাতে নেই। যদিও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অনেক উন্নয়নশীল দেশেই পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন ও বিতরণের সাহায্য/সহযোগিতা দিয়ে থাকে, এই বিনিয়োগ মাত্র একবারের (One-off) স্বল্প-মেয়াদী প্রকল্প এবং তা স্থানীয় প্রকাশনাকে ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে খুব কম্ কাজ করে থাকে।

বিদ্যালয়গুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা, শ্রেণীকক্ষে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী অসন্তোষজনক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে। সাকমেক[৪] (SACMEQ) দেশগুলোর ৪৭% বিদ্যালয় ভবনের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। আফ্রিকার বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণীকক্ষ অতিরিক্ত শিক্ষার্থীতে পূর্ণ, যেখানে তাদের জন্য চেয়ার, বেঞ্চ বা ডেস্ক নেই-এটি এদেশের একটি সাধারণ ব্যাপায়। বিশুদ্ধ পানি এবং

৩. *প্রগ্রেস ইন ইন্টারন্যাশনাল রিডিং লিটারেসী স্টাডি*

৪. *সাউদার্ন এন্ড ইষ্টার্ণ আফ্রিকা কনসোর্টিয়াম ফর মনিটরিং এডুকেশনাল কোয়ালিটি।*

স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিদ্যালয়ে বিশেষ করে মেয়েদের উপস্থিতিকে বাধাগ্রস্থ করে। সংঘাতপূর্ণ এলাকাতে বিদ্যালয়গুলোও সংঘাতের আওতামুক্ত থাকে না। ইরাকে ২০০৩ সালে ২৭০০ এরও বেশি বিদ্যালয়ে লুট-তরাজ হয়, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, বুরুন্ডি, কসোভো, মোজাম্বিক এবং টিমর-লেসতে শিক্ষার অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ধবংস করা হয়েছে। লাইবেরিয়াতে এক হিসাব মতে ২০০১ এবং ২০০৩ এর মধ্যে ২৩% প্রাথমিক বিদ্যালয় ধবংস করা হয়েছিল। আফগানিস্তানের বিদ্যালয়ে বোমা মারা ও পুড়িয়ে দেয়া, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হত্যা করায় কিছু প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং মান উন্নতিকরণ

পর্যাপ্ত সংখ্যক এবং সুশিক্ষিত শিক্ষক গোষ্ঠী/শক্তি ছাড়া সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর নয়। বিশ্ব জুড়ে ২০০৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায় ২৭ মিলিয়ন শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগ করা হয়, যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি পূর্ব এশিয়াতে, যেখানে সারা বিশ্বের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ২৮% ভর্তি হয়েছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মোট সংখ্যা ১৯৯৯-২০০৫ সালের মধ্যে ৫% বৃদ্ধি পায় যা ভর্তি বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম। সাব-সাহারান আফ্রিকা ঐ ছয় বছরের মধ্যে শিক্ষক সংখ্যা ২৫% এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া ১৪% বৃদ্ধি করে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভর্তি বৃদ্ধির হার সেখানে ছিল তীব্র-যথাক্রমে ৩৬% এবং ২২%। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষকদের মোট সংখ্যা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ ছাড়া সব অঞ্চলেই বৃদ্ধি পায় এবং এই বৃদ্ধি প্রাথমিক স্তরের চেয়ে দ্রুত গতিতে হয়।

শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (PTR) ৪০ : ১ এর বেশি হলে শিখন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে ১৭৬টি দেশের তথ্য রয়েছে তার মধ্যে ২৪টি দেশের শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত উক্ত বেঞ্চ মার্কের ওপরে এবং এর ২০টি দেশ সাব-সাহারান আফ্রিকায়, এবং সর্বাপেক্ষা বেশি অনুপাত কংগোতে (৮৩:১)। এই অনুপাত সাব-সাহারান আফ্রিকাতে বৃদ্ধি পেয়েছিল (৪১:১ থেকে ৪৫:১), দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে (৩৭:১ থেকে ৩৯:১)। এই অঞ্চলেই শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশি হয়েছিল। আরব দেশগুলো এবং প্যাসিফিক অঞ্চলে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী সংখ্যা একটু কমেছিল, যদিও ভর্তির হার বেড়েছিল। মোট কথা শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত প্রাইভেট স্কুলগুলোর চেয়ে সরকারি স্কুলে অনেক বেশি।

বতসোয়ানাতে ব্রেইল পদ্ধতি পড়তে শেখা

অনেক দেশেই ১৯৯৯ এর শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৪০:১ এর নিচে ছিল এবং তা আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। অবশ্য কিছু আশঙ্কাজনক ব্যতিক্রম রয়েছে ঃ আফগানিস্তানে যদিও শিক্ষক সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয় তবু শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ১৯৯৯ এর ৩৬:১ থেকে লাফিয়ে ২০০৫ সালে ৮৩:১ বা তার ওপরে ওঠেছিল। সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্রে বিশেষ করে ২০০১ এর পরে যখন স্কুল বেতন মওকুফ করা হয় তখন এক বছরেই ভর্তি ২৩% বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষক সংকট দেখা দেয়।

এইচআইভি/এইডস মরণ ব্যাধি শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও শেষ হয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

তবে চিত্রটি বদলে যায় যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা হিসাব করা হয়। স্বল্পতার কারণে এই অনুপাত প্রায়ই অনেক বেশি হয়ে থাকে। ২০০৫ সালে প্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের মিডিয়ান শতাংশ দক্ষিণ ও

পশ্চিম এশিয়াতে ছিল ৬৪%, মধ্য এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানে ৮০% বা তার বেশি, এবং আরব দেশগুলোতে ১০০%। মাত্র ৪৩টি দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ওপর ১৯৯৯ এবং ২০০৫ সালের উপাত্ত/তথ্য রয়েছে। প্রায় ৫০% দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা বেড়েছে। আফগানিস্তান, চাদ, মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক ও নেপালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত সংখ্যা ১০০:১ ছাড়িয়ে গেছে।

এইচআইভি/এইডসএর মাশুল উত্থাপন ছাড়া শিক্ষকগোষ্ঠীর কোন বিশ্লেষণই সম্পূর্ণ হবে না। এই মরণব্যাধি শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও ক্ষয় বা শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য একটি প্রধান কারণ। লেসেথো ও মালাবিতে মোট শিক্ষকের তিন ভাগের এক ভাগ শিক্ষকের বিদায় ঘটেছে জীবনহরণকারী অসুখে, ধারণা করা হয় যার বেশির ভাগই এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত। মোজাম্বিকে ২০০০-২০০৪ এর মধ্যে চাকুরিতে থাকাকালীন সময়ে মৃত্যু বেড়েছিল ৭২% শিক্ষকের। প্রজাতন্ত্রী তাঞ্জানিয়াতে ২০০০ এবং ২০০২ এর মাঝে ৪২% শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত অসুখের ফলে।

যেসব দেশে এখন পর্যন্ত জেন্ডার অসমতা রয়েছে তা প্রায়ই উচ্চ শিক্ষার স্তরে।

লক্ষ্য ৫ ঃ জেন্ডার প্যারিটি ও সমতা (Equality)

‘২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, মেয়েদের উন্নত মানের মৌলিক শিক্ষা প্রদানে পূর্ণ ও সমঅধিকার এবং কৃতিত্ব/সাফল্য অর্জনে নিশ্চিত করার প্রতি দৃষ্টি দেয়া।’

জেন্ডার বৈষম্য ১৯৯৯ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে কম থাকলেও বিশ্বজুড়ে তা এখনও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ২০০৫ সালে ১৮১টির মধ্যে (তথ্যানুযায়ী) মাত্র ৫১টি দেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উভয় স্তরে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করে। এই দেশগুলোর অধিকাংশই ১৯৯৯ সালে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করে, এ সবগুলোই উন্নত ও পরিবর্তনশীল দেশে, কিংবা ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের মাত্র ৭টি, সাব-সাহারান আফ্রিকার ২টি এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার ২টি দেশ ইএফএ-এর ক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি অর্থাৎ ছেলে-মেয়ের সংখ্যার মধ্যে সমতা অর্জন করেছে।

সাব-সাহারান আফ্রিকা, আরব দেশ, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপক বৈষম্য- প্রধানত ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বেশি। যেসব দেশে এখন পর্যন্ত জেন্ডার অসমতা রয়েছে তা প্রায়ই উচ্চ শিক্ষার স্তরে। বিশ্বের ১৮৮টি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১১৮টি দেশ (৬৩%) উক্ত স্তরে ২০০৫ সালের মধ্যে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করে এবং মাত্র ৩৭% দেশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এবং ৩% এর কম দেশ উচ্চ শিক্ষা স্তরে প্যারিটি অর্জন করে।

প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্যের প্রথম এবং প্রধানত সূত্রপাত ঘটে ১ম গ্রেডে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য থেকে (চিত্র ২.৩)। ২০০৫ সনে বিশ্বজুড়ে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে গড়ে ৯৪ জন মেয়ে ১ম গ্রেডে পড়া শুরু করে, যদিও সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (প্রতি ক্ষেত্রে ৯২ জন) এই সংখ্যা কম। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে এই সংখ্যা আরো কমে ১৯৯৩ এর ৯৫ জন থেকে ২০০৫ এ ৯৩ জন হয়। অন্যান্য অঞ্চলে এই সংখ্যা ৯৫ জন অথবা তার চেয়ে বেশি। মোট কথা, ১৯৯৯ থেকে শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য/পার্থক্য দূরীভূত হচ্ছে, অনেকক্ষেত্রে বেশি মাত্রায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৮৩ থেকে ৯২ জন মেয়ে শিক্ষার্থী)। তবে আফগানিস্তান, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকান, চাদ, নাইজার, পাকিস্তান ও ইয়েমেনে ছেলেদের তুলনায় ৮০% বা তার কম মেয়েরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করে থাকে।

চিত্র ২.৩: অঞ্চলভেদে ১৯৯৯ এবং ২০০৫ এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশে জেন্ডার বৈষম্যের পরিবর্তন

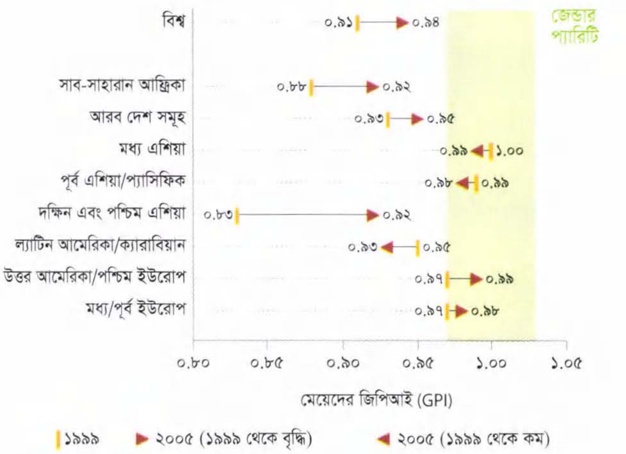

দ্রষ্টব্য: জিপিআই এই চিত্রে গড় হিসাবে দেখানো হয়েছে।
উৎস: অধ্যায়-২: পূর্ণাঙ্গ ইএফএ প্রতিবেদন।

অংশের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপকদের ওপর নির্ভর করে। বিভিন্নভাবে বেসরকারি শাখা এবং সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্বে রয়েছে সরাসরি অর্থায়ণ, চাকুরির চুক্তি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ। এসব সেক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাদি (Mechanism) রয়েছে। বোগোটা, কলম্বিয়ার সরকারি বিদ্যালয়সমূহ নিম্ন আয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য সরকারি সহায়তা গ্রহণ করে যাতে বিদ্যালয়ে শিশুদের ধরে রাখা যায় এবং শিখনফলের উন্নয়ন ঘটানো যায়। যাহোক, বেসরকারি ব্যবস্থাপকদের জন্য নিয়মগুলো বেশ ঝামেলাপূর্ণ এবং এটা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে এবং সুবিধাবঞ্চিতদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রায়ই সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে না। আইন-কানুন প্রয়োগে সরকারের সামর্থ্যের কমতিতে এবং সরকারি কাজে সুস্পষ্টভাবে দায়িত্ব দেয়া না থাকলে কার্যকর সজাগ দৃষ্টিতেও বিঘ্ন ঘটে। সরকারি কাজে নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য উৎসাহদানের লক্ষ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রসমূহের জন্য চিলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থনৈতিক উদ্দীপকের ব্যবস্থা করেছে। ভাল গুণগতমানের প্রমাণের শর্ত সাপেক্ষে উদ্দীপকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণ : অঙ্গীকার প্রায়শই বাস্তবতা থেকে ভিন্ন হয়

অনেক উন্নয়নশীল দেশই শিক্ষার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ আঞ্চলিক, প্রাদেশিক অথবা বিদ্যালয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করছে। বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হলো স্থানীয় চাহিদা পূরণে বিদ্যালয়গুলোকে আরো দায়িত্বপূর্ণ করে তোলা। প্রায়শই গুয়েতেমালার বিদ্যালয়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উল্লেখ করা হয় : প্রধান কাজগুলো যেমন- শিক্ষকদের নিয়োগদান, বেতন দেওয়া এবং তত্ত্বাবধান করা, এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পরিবীক্ষণ করার কাজ কমিউনিটি বিদ্যালয় কাউন্সিলের নিকট বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে জানা যায় যে, কাউন্সিলগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

বিকেন্দ্রীকরণ একটি দীর্ঘ এবং ধীর প্রক্রিয়া। শিক্ষার মান এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে এর প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট নয়। অনেক দেশ যেখানে এখনও কেন্দ্রীয়ভাবে কাজকর্ম চলছে, সেখানে স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন, তা সীমিত। ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব একটি সাধারণ সমস্যা। বিকেন্দ্রীকরণেরও অনেক ঝুঁকি রয়েছে, যা কিনা ঘোরতর অসমতাকে আরো খারাপের দিকে ঠেলে দেয়। ঘানার একটি মূল্যায়নের ফলাফলে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দরিদ্র এবং কম দরিদ্র এলাকায় বিদ্যালয়ের মানের বৈষম্য আরো প্রসারিত হয়েছে। আর্জেন্টিনা এবং মেক্সিকোতেও একই ধরনের ফলাফল দেখা গিয়েছে।

ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি

শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র এবং প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণকে শনাক্ত করে তাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সাড়া প্রদান করে তা নিশ্চিত করার জন্য ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক সরকারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। দেশগুলো শিশু যুবা এবং বয়স্কদের শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রধানত কোন ধরনের কৌশলসমূহ অবলম্বন করেছে? সর্বজনীন শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয় এমন একটি ব্যাপক উদ্যোগ (approach) ডাকার এজেন্ডায় ছিল যা একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন (hallmark)।

প্রাক-শৈশবকালীন : নতুন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

কম বয়স্ক শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং পিতামাতার সহায়তা এসবকে সমন্বিত করে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, সেগুলো শিশুদেরকে অসুবিধাগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে এবং অসমতা দূর করতে পারে। ব্রাজিলের ১৯৮৮ এর শাসনতন্ত্র সরকারকে ৬ বৎসর এবং তার নিচের বয়সের শিশুদের শিক্ষা এবং যত্ন প্রদানে বাধ্য করে। এই দেশের ২০০১ সালের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী এ শতাব্দীর শেষে ৪ বৎসর বয়সের ৫০% এবং ৪ এবং ৫ বৎসরের মধ্যে যাদের বয়স তাদের জন্য ৮০% লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ২০০৫ সালের মধ্যেই ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষাকে ফেডারেল ফান্ডের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই ফান্ড থেকে মৌলিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পুনর্বন্টন করা হবে। মেক্সিকো ২০০২ সালে তিন বৎসরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে ২০০৮ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি সাংবিধানিক সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ক্যাম্বোডিয়া, গুয়েতেমালা, ভারত, নিকারাগুয়া এবং ফিলিপাইনসহ অনেক দেশ দরিদ্রতম এলাকাগুলোকে লক্ষ্য করে সবচাইতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।

সার্বিকভাবে ইসিসিইএ বেশ কয়েকটি জাতীয় নীতিমালার এজেন্ডাভুক্ত হয়েছে, কিন্তু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে ঃ ৩ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দানের অভাব, সার্বিকভাবে উদ্যোগ নেওয়ার ঘাটতি, কম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এবং প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন সরবরাহকারীদের (providers) অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয়হীনভাবে কাজগুলো করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আরো স্থান

অনেক দেশে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং বস্তি এলাকায় শুধু বিদ্যালয়ের অভাবই ইউপিই অর্জনে বাধাস্বরূপ। ত্রিশটি দেশের কেইস স্টাডির বেশির ভাগেই দেখা যায় যে, বর্তমান বৎসরগুলোতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য সুবিদাবঞ্চিত এলাকাসমূহে বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও ভর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলো পর্যাপ্ত নয় (ইথিওপিয়াতে ১৯৯৯ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে যখন শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা ৫৫% এ উন্নীত করা হয় তখন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।) শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ এবং একাধিক সিফট চালুর মাধ্যমে সরকার দ্রুত প্রসারণের সাথে মানিয়ে চলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। অন্যরা বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো প্রসারণে অর্থায়নের জন্য পরিবারের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করছে: তুরস্কে ২০০৩ এবং ২০০৬ সালের মাঝে বেসরকারি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে এক লক্ষের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরি করা হয়েছে।

এনজিও, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সুশীল সমাজ যদি বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন করতে শিখন সামগ্রী, খাদ্য এবং পুষ্টির সম্পূরক কিছু এবং বিজ্ঞান ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি সরবরাহে সাহায্য করে তবে ফিলিপাইন সরকার তাদের ট্যাক্স ইনসেনটিভ দেয়। ২০০০ সাল থেকে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্ধেকেরও বেশি বিদ্যালয় এই কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কিছু অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব যেমন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের বেতন প্রদান এবং অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক খরচাদি ইত্যাদির দায়িত্ব কমিউনিটির ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগে বৈষম্য হ্রাসকরণ

অনেক সরকার দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোতে তহবিল পুনর্বন্টনের কার্যসাধন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেছে অথবা শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব অঞ্চল পিছিয়ে আছে উন্নয়নের জন্য সেসব অঞ্চলকে টার্গেট করেছে।

অনেক সরকার দরিদ্র অঞ্চলে অথবা শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে যে সকল এলাকার লক্ষ্যদল পিছিয়ে আছে তাদের জন্য তহবিল পুনর্বন্টনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে অথবা শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব অঞ্চল পিছিয়ে আছে উন্নয়নের জন্য সেসব অঞ্চলকে টার্গেট করেছে। বুরকিনা-ফাসোতে মৌলিক শিক্ষার জন্য ২০০১ সালে গৃহীত দশ বৎসরের পরিকল্পনা এর লক্ষ্য হচ্ছে বিশটি প্রদেশের জন্য বাড়তি সম্পদ আলাদা করে রেখে ভৌগোলিক বৈষম্য কমানো। বৎসরে প্রতিটি ছাত্রের ন্যূনতম খরচের সুরক্ষার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রে সম্পদের পুনর্বন্টন করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের জন্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর জন্য এই অর্থ অনেক অবদান রেখেছে। ভারতেও সরকার সুবিধাবঞ্চিত জেলাসমূহে বিশেষ কার্যক্রম প্রবর্তন করেছে।

বিদ্যালয় ফি মওকুফ ঃ উন্নতি অব্যাহত রাখা

২০০০ সাল থেকে চৌদ্দটি দেশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফ করেছে। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে এ ধরনের পদক্ষেপ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের বিনিময়ে ভর্তির হার দ্রুত বাড়ছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (PTRs) বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে অথবা বিদ্যালয়গুলো একাধিক সিফট চালু করেছে। সরকারের জন্য ফিস মওকুফের দুটো অর্থনৈতিক পরিণতি : বিদ্যালয় আর্থিকভাবে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার জন্য যে বাড়তি খরচের প্রয়োজন হয় সেটা সরকারকে দিতে হয়। ভর্তুকির জন্য সরাসরি বিদ্যালয়গুলোকে মাথাপিছু অনুদান দিতে হয়, কিন্তু বিদ্যালয়গুলো সবসময় সময়মত অনুদান পায় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে পরিমাণ অর্থ অনুদানের জন্য অঙ্গীকার করা হয় তার থেকে কম পায়। মালাওয়িতে ফিস মওকুফের জন্য যদিও অতিরিক্ত সম্পদের বরাদ্দ দেওয়া হয়, বেশি ছেলেমেয়ে ভর্তি হওয়ার ফলে শিক্ষার্থী প্রতি মাথা পিছু নির্ধারিত খরচের পরিমাণ হ্রাস পায়।

লেসোথো এবং মোজাম্বিকের প্রথম লক্ষ্য হলো সবচাইতে বঞ্চিত এলাকা অথবা এক সময়ে একটি করে গ্রেড নেওয়া যা সরকারকে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ এবং শিখন সামগ্রী দিয়ে বিদ্যালয়কে সহায়তা করতে সময় দেয়। কোন কোন সরকার শুধুমাত্র কোন বিশেষ দল, বিদ্যালয় অথবা অঞ্চলের জন্য ফিস মওকুফ করে : বোগোটা, কলম্বিয়াতে গ্রাটুইডাড প্রোগ্রাম (Gratuidad Programme) দরিদ্রতম পরিবারের শিশুদের জন্য ফিস কমিয়ে দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বল্প আয়ের দরিদ্র পিতামাতার সন্তানের জন্য আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ের ফিস মওকুফ করানো হয়। যদি বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফের সাথে সাথে শ্রেণীকক্ষ তৈরি, অধিক শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থার উন্নয়ন না ঘটে, তবে শিখন পরিবেশের অবনতি হয়, এবং এ সকল কারণেই শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত না করে অনেক আগেই ঝরে পড়ে অথবা খুব কম সাফল্য অর্জন করে। অনেক দেশেই বেতন মওকুফ করার কারণে দাতাগোষ্ঠী অতিরিক্ত খরচের কিছু অংশ বহন করছে, এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ঘানা, কেনিয়া, মোজাম্বিক, উগান্ডা এবং তানজানিয়ার যুক্ত প্রজাতন্ত্র।

লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

সবচাইতে দুর্বল এবং মেয়ে শিশুসহ সকল প্রান্তিক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করার জন্য সর্বজনীন নীতিমালা পর্যাপ্ত নয় (বক্স ৩.১)। বিদ্যালয়ের বেতন ছাড়াও পরিবারগুলো বিভিন্ন ধরনের চার্জ যেমন: পোষাক, যাতায়াত, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মেটানোর সম্মুখীন হয়, যা শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও, দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত বহু শিশুর জন্য পারিশ্রমিক অথবা বিনা পারিশ্রমিকে বাড়িতে কাজে নিযুক্ত থাকলে অনেকেই বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। এ ধরনের অর্থনৈতিক বাধা অতিক্রমের জন্য, অনেক সরকার দরিদ্র পরিবারগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে কিছু কার্যক্রমের নকশা প্রণয়ন করেছে। মেয়েদের জন্য তারা স্কলারশীপ চালু করেছে। শর্তসাপেক্ষে মেয়েদেরকে নগদ অর্থও প্রদান করা হয়। শেষেরগুলোর মধ্যে ব্রাজিলের বলসা ফেমালিয়া হলো উন্নয়নশীল বিশ্বে এ ধরনের সবচাইতে বৃহৎ একটি কার্যক্রম, যার আওতায় প্রায় ৪৬ মিলিয়ন মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে ১৬ মিলিয়নেরও বেশি শিশু রয়েছে যারা বিশেষ Bolsa Escola Education Transfer গ্রহণ করে। মেক্সিকোতে দারিদ্র্য বিমোচন প্রোগ্রাম-প্রগ্রেসা অপারটুনাইডাডস এ ২০০৫ সালে ৫.৩ মিলিয়ন শিশু অন্তর্ভুক্ত হয়। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির শর্তসাপেক্ষে এসব শিশুকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। গবেষকদের হিসাবে দেখা যায়, ল্যাটিন আমেরিকার ১৮টি দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশু যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে তাদের জন্য এ ধরনের কার্যক্রমে বৎসরে ২.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ হবে।

অনেক মধ্য আয়ের ল্যাটিন আমেরিকান দেশে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য শর্তসাপেক্ষে নগদ টাকা হস্তান্তর (cash transfer) কার্যক্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্রতর দেশগুলোতে এ ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হলে, সতর্কতার সাথে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং জালিয়াতি থেকে রক্ষা পেতেও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা এবং কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাদির প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বৃহৎ পরিসরে এর বাস্তবায়নের পূর্বে পাইলট পর্যায়ে প্রধান বাধাগুলো শনাক্ত করা উচিত। সাধারণত যে সকল বাধা আসে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যাদেরকে এই কার্যক্রমের সুফল লাভের জন্য নির্বাচন করা হবে, তাদের নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থ প্রদানের ব্যবস্থাপনায় সমস্যা এবং পরিবীক্ষণের অভাব। আর একটি সমস্যা যেটা প্রায়ই ঘটে সেটা হলো বদলী (transfer) কার্যক্রম এবং শিক্ষা নীতিমালার মধ্যে দুর্বল যোগসূত্র। সুবিধাবঞ্চিতদের নিরাপত্তার জন্য বদলী কার্যক্রম দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে বিশেষ শিখন উদ্দেশ্যসমূহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বক্স ৩.১: জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে নীতিমালাসমূহ

২০০৫ সালের জন্য নির্ধারিত জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্য বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশই অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু ঐ সকল দেশের অনেকগুলোতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় যে বৈষম্য ছিল ১৯৯৯ সাল থেকে তার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটেছে। এটা কীভাবে ঘটেছিল তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো:

বুরকিনা ফাসো ঃ বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিশুদের একদল মায়েদের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে পাঠরত মেয়ে শিশুদের পিতামাতাকে, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতিকে আর কোন চাঁদা প্রদান করতে হয় না।

ইথিওপিয়া ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রোগ্রামসমূহ বিশেষ করে মেয়ে, মেষপালক এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে সমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের ওপর জোর/গুরুত্ব দেয়। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়কে সংবেদনশীল করার প্রচারনা এবং মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম এবং বিদ্যালয়ে পানি সরবরাহ এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করা। মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলো কোটা পদ্ধতি চালু করেছে।

ভারত ঃ লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক পদক্ষেপসমূহ: অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদেরকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা, মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয় বহির্ভূত মেয়েদেরকে পড়ালেখার সাথে সংযুক্ত রাখার জন্য শূন্যতা পূরণের কোর্স চালু করা এবং মহিলা শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদান। সুবিধাবঞ্চিত দলের এবং গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের লক্ষ্য করে ২০০৩ সালে একটা জাতীয় কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। এর সার্বিক উদ্যোগ হলো কমিউনিটিকে গতিশীল করা, প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে মেয়েরা তাদের ভাইবোনদেরকে দেখাশোনার হাত থেকে অব্যাহতি পায়, বিনামূল্যে পোষাক এবং শিখন সামগ্রী এবং শিক্ষকদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ইয়েমেন ঃ দেশের সার্বিক সেক্টরাল নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দুতে মেয়েদের জাতীয় শিক্ষা কৌশল স্থান পেয়েছে। মূল বিষয় হচ্ছে মেয়েদের এবং মহিলাদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রদায়ের গতিশীলতা আনয়ণ, শুধু মেয়েদের জন্য এবং সহ-শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এবং আরো মহিলা শিক্ষকদের নিয়োগ দান। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পড়াশুনা করে যেসব মহিলারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হয়েছে তাদেরকেই স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোর নিচের গ্রেডগুলোতে পড়ানোর জন্য নির্বাচিত করা হয়। তারা প্রফেশনাল সহায়তাসহ, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০০৬ সালে মেয়েদের বিদ্যালয় বেতন মওকুফ করা হয়।

শিশুশ্রমকে মোকাবেলা করা

শিশুশ্রমে নিয়োজিত থাকার কারণে অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। যদিও ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমে

বেতন ছাড়াও পরিবারগুলো বিভিন্ন ধরনের চার্জ যেমন: পোষাক, যাতায়াত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মেটানোর সম্মুখীন হয়, যা তাদের বিদ্যালয় পড়াশুনা করার জন্য বাধাস্বরূপ।

গিয়েছে, তথাপি এখনও ২১৮ মিলিয়ন শিশু কাজে নিয়োজিত, যার ফলে তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বেশির ভাগ দেশেই বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির জন্য আইন করে শ্রমে নিয়োজিত হওয়ার একটা ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বিশেষ কয়েক ধরনের কাজ শিশুদের জন্য বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ বেশ দুর্বল। দারিদ্র্য যদি শিশু শ্রমের প্রধান কারণ হয়, তবে এর মোকাবিলা করা আরো কষ্টসাধ্য। পরিবারগুলোর জন্য ভাতা বরাদ্দ করার কারণে আরো বেশি শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে, কিন্তু এখনও অনেকে একই সময়ে কাজও করছে। শ্রমজীবী শিশুদের শিখন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশগুলো বিকল্প ব্যবস্থা চালু করেছে। স্বল্প পরিসরেই কার্যক্রমগুলো চালানো হচ্ছে এবং এটির পর্যাপ্ত মূল্যায়নও করা হয়নি। কাজের মৌসুমে বিদ্যালয়ের সময়সূচি নমনীয় রাখা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে শিখন মডুলগুলোর মাধ্যমে শেখার বা গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কাজে যে সময়টা ব্যয় হয়েছে, সেটা পুষিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মরত শিশু যারা বিদ্যালয়ের পড়াগুলো করতে পারেনি সেগুলো যেন তারা জানতে পারে এবং পরিশেষে নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে, এ জন্য নিবিড় কোর্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (৩৫০,০০০) এর বেশি শিশু যারা অনানুষ্ঠানিক শাখায় কর্মরত, তাদের জন্য এ ধরনের দু'বৎসরের কোর্সের মাধ্যমে বৈষম্য কমানো হয়েছে। ব্রাজিলের শিশুশ্রম দূরীকরণ কার্যক্রম একটি প্রশস্ত উদ্যোগ ঃ এর মধ্যে রয়েছে পরিবারগুলোর জন্য ভাতা, শিশুশ্রম আইনের সাথে নিয়োগকারীদের সম্মতির কড়াকড়ি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সমকক্ষতা (ইকুইভেলেন্সি) এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী। তিনটি দরিদ্রতম রাষ্ট্রের এ ধরনের কার্যক্রমের মূল্যায়নে দেখা যায় যে, শিশুশ্রমের সম্ভাব্যতা কমে গিয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাদের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে।

বিশেষ করে ইউরোপে এর স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানপূর্বক সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি করা হোক।

বিদ্যালয়গুলোতে নৃতাত্ত্বিক বৈষম্য কমানো

স্বদেশী দল এবং নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সম্ভাবনা কম এবং বেশির ভাগ সময়েই তাদেরকে একই গ্রেডে একাধিকবার থাকতে দেখা যায়। দশটি ল্যাটিন আমেরিকার দেশের তথ্যে দেখা যায় যে, জেন্ডার অথবা বসবাসের স্থানের জন্য বৈষম্যের তুলনায় যারা স্বদেশীয় অথবা যারা স্বদেশীয় নয় তাদের মধ্যে শিক্ষার অর্জনের বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট।

শিখনের ক্ষেত্রে ভাষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। গুয়েতেমালা এবং মেক্সিকোতে দোভাষীয় শিক্ষা কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের শিশুদের বিদ্যালয়ের ফলাফলে উন্নতি দেখা যায়। এ ধরনের কার্যক্রম সমুহের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় ভাষায় শিখন সামগ্রী প্রণয়ন এবং বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যাযাবর এবং মেষপালক সম্প্রদায়ের শিশুরাও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। মঙ্গোলিয়া এবং ইথিওপিয়াসহ অনেক দেশের সরকারই হোস্টেলের সুবিধাসহ বিদ্যালয় স্থাপন করে এ সব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে। যদিও গুণগত মান ঠিক রাখা চিন্তার বিষয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যে রোমার অবস্থা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও ধীরে ধীরে সুসংগঠিত বিচ্ছিন্ন অবস্থার অবসান ঘটছে, তবুও রোমার শিশুরা অনানুষ্ঠানিকভাবে বাদ পড়ছে। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে বিদ্যালয়গুলো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার কৌশল হিসেবে আর্থিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা করেছে এবং শিশুদের এবং তাদের পরিবারদের সহায়তা করার জন্য শ্রেণীকক্ষে মধ্যস্থতাকারীদের নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য একীভূত শিক্ষা

সম্প্রতিকালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কনভেনশনে শিক্ষার সকল পর্যায়ে তাদের একীভূত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপে এর স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানপূর্বক সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি করা হোক। সম্প্রতিকালে অনেক উন্নয়নশীল দেশ একীভূত শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্রাজিলে, ২০০২ সালের শিক্ষা আইন বিশেষ শিখন চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভর্তির জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সরকার বিশেষ শিক্ষক নিয়োগের অঙ্গীকার করেছে। ইথিওপিয়ায় ২০০৬ সালে বিশেষ শিক্ষা চাহিদার কৌশল প্রবর্তন করা হয় যা শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে পারে যাতে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনে অসুবিধা শনাক্ত করতে পারে এবং তাদের সহায়তাদানের ব্যবস্থা করাতে পারে।

যুবা এবং বয়স্কদের শিখন সুযোগ বৃদ্ধি করা

যুবা এবং বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এতে অর্থায়নের ঘাটতি রয়েছে। যুবা এবং বয়স্কদের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান বৎসরগুলোতে কয়েকটি সরকার জাতীয় কাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, নেপাল এবং থাইল্যান্ড উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কৃষিকাজ এবং শিল্প-বাণিজ্যে দক্ষতার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের সাথে, কীভাবে পড়াও শেখা যায় তার জন্য শিখন সামগ্রী তৈরি করেছে। যুবা এবং

মুখবন্ধ

সাত বছর আগে ১৬৪টি দেশের সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অংশীদার সংগঠনগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে শিশু, তরুন, এবং বয়স্কদের জন্য নাটকীয় তথা চমকপ্রদভাবে শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর জন্য সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করেছিল। সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্বশিক্ষা ফোরামে অংশগ্রহণকারীগণ মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে (anchored) শিক্ষার একটি সমন্বিত দূর ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা রূপকল্প (vision) গ্রহণ করে যা সব বয়সেই শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, এবং সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র, দুর্বল, এবং ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্তদের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিল।

সবার জন্য শিক্ষার গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের ষষ্ঠ সংস্করণে এসব অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি কি মাত্রায় অর্জিত হয়েছে তার মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে। "ডাকারের প্রভাব" পরিষ্কার, এটি প্রতীয়মান যে অভিন্ন লক্ষ্যগুলোকে কেন্দ্র করে সবাই মিলিত হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে দেশগুলোকে গতিশীল এবং সংগঠিত করা যায়, যা জনগণের ব্যক্তি জীবনকে ক্ষমতাসম্পন্ন করতে পারে। আংশিকভাবে হলেও বেতন মওকুফের কারণে ২০০০ সালে অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ঐসব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি ভর্তি হয়েছে যারা ডাকারে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন থেকে অনেক পেছনে ছিল। অনেক দেশের সরকার বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি হওয়াকে উৎসাহিত করেছে এবং দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়ার জন্য সুনির্ধারিত কৌশল প্রবর্তন করেছে। অনেক দেশেই শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা অর্জন জাতীয়ভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে যা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সাহায্যের নিম্নগামিতা উদ্বিগ্নের কারণ হলেও মৌলিক শিক্ষাখাতে ২০০০ সাল থেকে সাহায্য দ্রুত বাড়ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা যত সম্প্রসারিত হচ্ছে তত বেশি জটিল এবং সুনির্দিষ্ট সমস্যা তথা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, এবং যে কোন পটভূমি থেকে আগত সকল শিশু ও তরুণ-তরুণীদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের যুগের চ্যালেঞ্জ: দ্রুত নগরায়ন, এইচ.আই.ভি/এইডস মরণব্যাধি এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজের চাহিদা মোকাবেলা করতে হবে। এসব বাধ্যবাধকতা সম্পাদনে কোন ব্যর্থতা সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অঙ্গীকারের ব্যত্যয় ঘটাবে।

আমরা সঠিক পথেই হাল ধরেছি কিন্তু আগত বছরগুলোতে দরকার হবে অপরিবর্তনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার যা বিরামহীনভাবে প্রাক-শৈশবকালীন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষাকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দিবে, সরকার, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি/প্রাইভেট খাতের মধ্যে গঠনমূলক অংশীদারিত্বের কাজে আবদ্ধ করবে, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে গতিশীল ও সমন্বিত সাহায্য-সহযোগিতা উৎসারিত করবে। সময় এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ : ৭২ মিলিয়ন বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য, মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতাবিহীন প্রতি ৫ জনের ১ জন বয়স্কের জন্য, এবং অনেক শিক্ষার্থী যারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন ছাড়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে থাকে তাদের জন্য।

সবার জন্য শিক্ষার গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টটিতে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রমাণভিত্তিক তথ্যাদি রয়েছে যা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাকে তুলনা করতে, নির্ধারিত নীতিমালার ধনাত্মক প্রভাব বুঝতে এবং যখন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং অঙ্গীকার থাকে তখন উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব তা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

প্রতিটি উন্নয়ন এবং শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত স্টেক-হোল্ডারদের আমি এই প্রতিবেদনটি গাইড বা নির্দেশিকা এবং সাহসী ও টেকসই কর্ম প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহারের জন্য আবেদন জানাই। আমরা ব্যর্থ হতে পারি না, আমাদের ব্যর্থ হলে চলবে না।

K. Matsuura

সবার জন্য শিক্ষা প্রতিবেদন ২০০৮ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রধান প্রধান অগ্রগতি ঃ ২০০০ সাল থেকে

- ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯৯৯-২০০৫ সালের মধ্যে ৬৪৭ মিলিয়ন থেকে ৬৮৮ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির হার সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ৩৬% এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে ২২% হয়। ফলে বিদ্যালয় বহির্ভূতদের সংখ্যা কমে যায়, এবং এই কমার গতি ২০০২ সালের পর থেকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
- বুরকিনা-ফাসো, ইথিওপিয়া, ভারত, মোজাম্বিক, সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রী তানজানিয়া, ইয়েমেন এবং জাম্বিয়াতে প্রাথমিক স্তরে সকল শিশুকে ভর্তি এবং ছেলে ও মেয়েদের সমান সংখ্যায় ভর্তি তথা জেন্ডার প্যারিটির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি হয়েছে, যাতে দেখা যায় যে জাতীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এ জাতীয় অর্জন সম্ভবপর হয়ে থাকে।
- প্রাথমিক স্তরে ২০০০ সাল থেকে ১৪টি দেশে বেতন মওকুফ করা হলেও শিক্ষার ব্যয় লক্ষ লক্ষ শিশু, কিশোর, তরুন-তরুনীদের শিক্ষা গ্রহণে প্রধান বাধা হিসাবে রয়ে গেছে।
- জেন্ডার প্যারিটির লক্ষ্য নাগালের বাইরে রয়ে গেছে; কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশ ২০০৫ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরে তা অর্জনের কথা জানিয়েছে, মাত্র ৩টি দেশ ১৯৯৯ সাল থেকে তা অর্জন করেছে (যদিও উক্ত সময়ের মধ্যে ১৭টি দেশ প্রাথমিক এবং ১৯টি দেশ মাধ্যমিক স্তরে এটা অর্জন করেছে)।
- ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে শিখন দক্ষতার ওপর পরিচালিত মূল্যায়নগুলোতে দেখা যায় যে নিম্নমানের ও অসম শিখনফল অর্জিত হয়েছে, যাতে নিম্নমানের শিক্ষা যে সবার জন্য শিক্ষার অর্জনকে দুর্বল করে দিচ্ছে তার প্রতিফলন রয়েছে।
- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও জেন্ডার প্যারিটি অর্জনের ওপর প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা, সাক্ষরতা, যুব ও বয়স্কদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সরাসরি প্রভাব থাকলেও জাতীয় সরকার ও দাতাগোষ্ঠী ঐসব কার্যক্রমের চেয়ে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।
- নিরক্ষরতা ন্যূনতম রাজনৈতিক সুদৃষ্টি বা মনোযোগ পাচ্ছে এবং সারা বিশ্বের জন্য তা লজ্জাজনক হয়ে রয়েছে, প্রতি ৫ জনে ১ জন বয়স্ক ব্যক্তি (প্রতি ৪ জনে ১ জন মহিলা) সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে।
- স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে ২০০০ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে মৌলিক শিক্ষাখাতে সাহায্য দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায় কিন্তু তা ২০০৫ সালে গুরুত্বপূর্ণভাবে কমে যায়।

সবার জন্য শিক্ষার ছয়টি লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বের অবস্থান কোথায়

- সবার জন্য শিক্ষার উন্নয়নসূচকে দেখা যায় যে ১২৯টির মধ্যে ৫১টি দেশ ইএফএ-এর ৪টি পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য (সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতা, জেন্ডার ও শিক্ষার গুণগত মান) অর্জন করেছে কিংবা অর্জনের কাছাকাছি রয়েছে, ৫৩টি দেশ মধ্যবর্তী অবস্থায় এবং ২৫টি দেশ ইএফএ অর্জন থেকে বেশ দূরে রয়েছে। পেছনের সারির দেশগুলোর সংখ্যা আরো বেড়ে যেত যদি দুর্বল ও নাজুক দেশ, সংঘাতপূর্ণ কিংবা সংঘাত পরবর্তী দেশগুলো যেখানে খুব নিম্নমানের শিক্ষার উন্নয়ন ঘটেছে তার তথ্য পাওয়া যেত।

১. *প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা*

- যদিও শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, অধিকাংশ দেশেই তিন বছরের নিচে শিশুদের যত্ন ও শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করছে না।
- তিন বছর এবং তার ওপরের বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বাড়লেও সাব-সাহারান আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোতে তা খুবই অপ্রতুল।
- প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রম সাধারণত দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের কাছে পৌছায় না অথচ এরাই এ জাতীয় কার্যক্রম থেকে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে।

২. *সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা*

- যে ২৩টি দেশে ২০০০ সালে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের অভাব ছিল সেসব দেশে এখন তা প্রবর্তন করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন এখন ২০৩টি দেশ ও অঞ্চলসমূহের ৯৫% অংশেই রয়েছে।
- বিশ্বব্যাপী নেট ভর্তির অনুপাত ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে ৮৩% থেকে ৮৭% এ বৃদ্ধি পায় যা ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ের চেয়ে দ্রুততর। এই অংশগ্রহণের হার দ্রুত বৃদ্ধি পায় সাব-সাহারান আফ্রিকা (২৩%), দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (১১%)।
- বিদ্যালয় বহির্ভূতদের সংখ্যা ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে ২৪ মিলিয়ন থেকে ৭২ মিলিয়ন পর্যন্ত কমেছে। বিদ্যালয় বহির্ভূতদের ৩৭% রয়েছে ৩৫টি দুর্বল ও নাজুক দেশে।
- সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বিভিন্ন অঞ্চল, প্রদেশ, রাজ্য, কিংবা একই দেশে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে পার্থক্য বিরাজ করছে। দরিদ্র, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী থেকে আগত শিশুরা যেমন অসুবিধার মধ্যে থাকে তেমনি বস্তিতে বসবাসকারী শিশুরা একই অবস্থায় থাকছে।
- বর্তমান গতিধারায় ৮৬টি দেশের যে ৫৮টি দেশ এখন পর্যন্ত সকল শিশুকে ভর্তি করতে পারেনি ২০১৫ সালেও সেসব দেশ তা অর্জন করতে পারবে না।

৩. *তরুন ও বয়স্কদের শিখন চাহিদা*

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে, যদিও কোন কোন সরকার সম্প্রতি টেকসই ব্যবস্থার জন্য জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে।
- খানা জরিপ করে দেখা যায় যে বিশ্বের দরিদ্রতম অনেক দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অসুবিধাগ্রস্ত বহু তরুন এবং বয়স্কদের শিক্ষা লাভের প্রধান উপায় হিসাবে কাজ করে থাকে।

৪. *বয়স্ক সাক্ষরতা*

- সারা বিশ্বে গতানুগতিক পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে ৭৭৪ মিলিয়ন বয়স্কদের মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতা নেই। এদের মধ্যে ৬৪% নারী এবং এ হার নব্বই দশকের শুরু থেকেই অপরিবর্তিত রয়েছে। সাক্ষরতার দক্ষতা সরাসরি পরিমাপ করলে বিশ্বব্যাপী যারা সাক্ষরতার অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে।
- একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম চীন ছাড়া গত দশকে অধিকাংশ দেশেই বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে খুব সামান্যই অগ্রসর হতে পেরেছে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বয়স্কদের সাক্ষরতা হার ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে ৬৮% থেকে ৭৭% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- যে ১০১টি দেশ 'সর্বজনীন সাক্ষরতা' অর্জন থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে এদের মধ্যে ৭২টি দেশই ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক নিরক্ষরতার হার অর্ধেকেও নামিয়ে আনার সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

৫. *জেন্ডার*

- তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে মাত্র এমন ৫৯টি দেশ ২০০৫ এর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে, ৭৫% দেশ (উপাত্ত অনুযায়ী) প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার প্যারিটি অর্জন অথবা অর্জনের কাছাকাছি রয়েছে (১৯৯৯ থেকে আরো ১৭টি দেশ), অন্যদিকে ৪৭% দেশ মাধ্যমিক শিক্ষায় তা অর্জন অথবা অর্জনের কাছাকাছি রয়েছে (১৯৯৯ থেকে ১৯টি অতিরিক্ত দেশ যোগ হয়েছে।)
- মাধ্যমিক শিক্ষায় কম হারে ছেলেদের অংশগ্রহণ ও কম হারে সাফল্য অর্জন একটি ক্রমবৃদ্ধিমান চিন্তার বিষয় হিসাবে দেখা দিচ্ছে।
- মাত্র ১৮টি দেশ (১১৩টি দেশের মধ্যে), ২০০৫ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জেন্ডার প্যারিটি অর্জনের লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি, ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের সেটা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

- জেন্ডার সমতা (eqality) এখনও নাগালের বাইরে (elusive), যৌন সহিংসতা, অনিরাপদ বিদ্যালয় পরিবেশ, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা মেয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মসম্মানবোধ, শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও বিদ্যালয়ে টিকে থাকার ওপর অনানুপাতিক হারে বা ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সমাজে প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকাকেই জোরদার করে চলেছে।

৬. *গুণগত মান*

- অধিকাংশ দেশের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ এবং ২০০৪ এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের শেষ গ্রেড/শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকার হার বাড়লেও সাব-সাহারান আফ্রিকাতে (মিডিয়ান হার ৬৩%) এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে (৭৯%) এটা কম ছিল।
- বিশ্বের অনেক দেশেই শিক্ষার্থীদের ভাষা ও গণিতে অর্জন নিম্নমানের এবং শিখন দক্ষতা অর্জনে অসমতা দেখা যায়।
- ভগ্নদশা তথা জরাজীর্ণ (dilapidated) শ্রেণীকক্ষ, অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, অতি অল্প পাঠ্যপুস্তক এবং অপর্যাপ্ত শিখন-সময়, এই পরিস্থিতি বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল ও দুর্বল দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে বিরাজমান।
- সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে ১৯৯৯ থেকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত বেড়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য বিশ্বজুড়ে এই স্তরে ১৮ মিলিয়ন নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে।
- অনেক দেশের সরকারই খরচ বাঁচানো এবং দ্রুত শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে, কিন্তু যে দেশে এই ধরনের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব এবং চাকুরির সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি রয়েছে, সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা শিক্ষায় গুণগত মানের ওপর ভবিষ্যতে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে।

সবার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থায়ন

জাতীয় ব্যয়

- উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বাইরে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে ৫০টি দেশে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে শিক্ষাখাতে খরচ বাড়ে এবং ৩৪টি দেশে তা কমে যায়।
- সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া- এই দুই অঞ্চলই সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে । সেখানে শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় প্রতি বছর ৫% এর বেশি বেড়েছে।
- প্রাথমিক স্তরে ২০০৫ সালে নেট ভর্তির অগ্রগতি যেসব দেশে ৮০% এর নিচে কিন্তু সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে যথেষ্ট এগিয়ে আছে, সেসব দেশ জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গড়ে শিক্ষার ব্যয় ১৯৯৯ এর ৩.৪% থেকে বৃদ্ধি করে ২০০৫ সালে ৪.২% করে। যেসব দেশে অগ্রগতি মন্থর ছিল সেসব দেশে এ ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের ভাগ কমে যায়।

মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য

- মৌলিক শিক্ষায় জন্য অঙ্গীকার করায় ২০০০ সালে ২.৭ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার থেকে ২০০৪ সালে ৫.১ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার পর্যন্ত অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি পায়। আবার ২০০৫ সালে উক্ত সাহায্য কমে ৩.৭ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার হয়।
- বিশেষ করে স্বল্প আয়ের দেশগুলো বর্ধিত সাহায্য থেকে উপকৃত হয় এবং ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে এই দেশগুলো গড়ে প্রতি বছর ৩.১ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার সাহায্য পায়। যদি বর্তমান ধারায় মোট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়, তাহলে ২০১০ এ মৌলিক শিক্ষায় দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের পরিমাণ বছরে ৫ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলারে উন্নীত হবে। এমন কি যদি এর সাথে বহুজাতিক সাহায্য যোগ হয়, তা হলে এর পরিমাণ প্রতি বছরে ১১ বিলিয়ন ডলারেরও অনেক কম হবে যা সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন।
- সবচেয়ে চাহিদাগ্রস্ত দেশগুলোকে শিক্ষাখাতে সাহায্যের জন্য টার্গেট করা হয় নাই, এবং প্রাক-শৈশবকালীন ও সাক্ষরতা কর্মসূচির জন্য সাহায্যের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ দেয়া হয়ে থাকে।

উচ্চ মাত্রার নীতি বিষয়ক অগ্রাধিকারসমূহ

- সর্বজনীন শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ণ এবং সবার জন্য শিক্ষার ছয়টি লক্ষ্য অর্জনের সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগিয়ে বর্ধিতহারে অংশগ্রহণ, ন্যায়বিচার (equity) ও মানের অগ্রগতি সাধন একত্রে করা যেতে পারে।
- যে সব বিষয়ের ওপর শিক্ষানীতিগুলোর জোড়ালো দৃষ্টি দেয়া উচিত তা হচ্ছে, একীভূত শিক্ষা (inclusion), সাক্ষরতা, গুণগতমান, দক্ষতার উন্নয়ন ও অর্থায়ণ।
- এছাড়াও সবার জন্য শিক্ষার আন্তর্জাতিক রূপরেখা বা নকশাকে আরো বেশি কার্যকর বা ফলপ্রসূ করা উচিত।

জাতীয় সরকারসমূহ

একীভূতকরণ বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপসমূহ

- প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কর্মসূচি যাতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষার উপাদান রয়েছে তা বিশেষ করে সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য নিশ্চিত করা;
- নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়গুলোর কুলিয়ে উঠার জন্য বেতন মওকুফ, পর্যাপ্ত স্থানের সুবিধা তৈরি এবং শিক্ষকের ব্যবস্থা করা;
- দরিদ্রতর পরিবার থেকে আগত শিশুদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান যেমন স্কলারশীপ, নগদ টাকা বা কোন দ্রব্য প্রদান;
- শিশু শ্রমের চাহিদা দূরীকরণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ, নমনীয় বিদ্যালয় সময়সূচি নির্ধারণ, কর্মজীবী শিশু ও যুবক/যুবতীদের জন্য সমতুল্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্সের ব্যবস্থা করা;
- একীভূত শিক্ষানীতি জোরদার করা, যাতে সকল প্রতিবন্ধী শিশু, সকল আদিবাসী এবং অসুবিধাগ্রস্ত শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষার অংশগ্রহণ করতে পারে;
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে মনোযোগ দেয়া, যেসব দেশে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম সে ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ান এবং বাড়ির কাছে উপযুক্ত বা মানসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ বিদ্যালয় স্থাপন করা;
- যুবক/যুবতী এবং বয়স্কদের জন্য দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, পর্যাপ্ত লোকবল, অর্থায়ণকৃত ও সু-সংগঠিতভাবে সম্প্রসারিত সাক্ষরতা কর্মসূচির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া, এবং এর জন্য সকল গণমাধ্যমের (media) শক্তি ব্যবহার করা;
- গণমাধ্যমে ও প্রকাশনা পলিসি প্রতিষ্ঠা করা যা পঠনের উন্নয়ন ঘটায়।

গুণগত মান বৃদ্ধির পদক্ষেপসমূহ

- শিক্ষকতার পেশায় নতুনদের যোগদানে আকৃষ্ট করার জন্য উদ্দীপনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, পেশাগত উন্নয়নসহ শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পর্যাপ্ত শিখন-শেখানোর সময়, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন ও বিতরণ নীতি নিশ্চিতকরণ;
- নিরাপদ ও সুস্থ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়াবলীর মাধ্যমে জেন্ডার সমতা উন্নয়ণ করা;
- বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বছরগুলোতে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়া।
- মানসম্মত শিক্ষার অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর জন্য সরকার এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে গঠনমূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

সক্ষমতা (Capacity) এবং অর্থায়ন বৃদ্ধির পদক্ষেপসমূহ

- অর্থায়নের ধারা বজায় রাখা, কিংবা যেখানে প্রয়োজন সরকারি ব্যয় বাড়ান, লক্ষ রাখা যে সবচেয়ে প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্তদের ভর্তি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় বাড়তে পারে।
- প্রাক-শৈশবকালীন, সাক্ষরতা, গুণগত মানবৃদ্ধি বিশেষ করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়নের জন্য অর্থায়ণ বৃদ্ধি করা।

- সরকারের প্রতিটি স্তরে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- যেসব মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রাক-শৈশবকালীন এবং সাক্ষরতা কার্যক্রম রয়েছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- সবার জন্য শিক্ষার নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এ সুশীল সমাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত করা।
- শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং তা ব্যবহার করার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা।

সুশীল সমাজ

- সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোকে আরো শক্তিশালী করা যাতে সবার জন্য শিক্ষার উন্নয়নে নাগরিকবৃন্দকে তারা সোচ্চার করতে পারে যাতে দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নাগরিকবৃন্দের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।
- শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এ সরকারের সংগে কাজ করা।
- শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ ও অর্থায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহদান।

দাতাগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ

- মৌলিক শিক্ষার দ্রুত সাহায্য বাড়ান যাতে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১১ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলারের বহি:অর্থায়ন এর চাহিদা মেটানো যায়;
- খাতওয়ারী দ্বি-পক্ষীয় সাহায্যের ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষার অংশ ন্যূনতম ১০% বাড়ান;
- অধিক পরিমাণের সাহায্য কার্যকরভাবে ব্যবহারে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- নিশ্চিত করতে হবে যে সাহায্য:

  লক্ষ্যদল নির্ধারিত করে যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে সেসব দেশে দিতে হবে, বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকার সবচেয়ে দুর্বল ও নাজুক দেশসমূহে সাহায্য পাঠাতে হবে;

  অনেক বেশি ব্যাপক হবে: যাতে প্রাক-শৈশবকালীন, তরুন, এবং বয়স্ক সাক্ষরতা, দক্ষতাভিত্তিক কার্যক্রম, নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা তৈরি, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে;

  মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা অপেক্ষা ইএফএ এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে।

  দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাগুলোকে সাহায্য করার লক্ষ্যে অনেক বেশি নিশ্চিত হবে।

  সরকারি কর্মসূচি ও জরুরিভিত্তিক কাজের সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্য/মিল রেখে চলবে।

||||| অধ্যায় ১: সবার জন্য শিক্ষার স্থায়ী প্রাসংগিকতা (relevance)

সবার জন্য শিক্ষার গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১৫ সাল এর মধ্যে প্রতিটি শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত ও উন্নত করার একটি উচ্চাকাঙ্খী আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার মধ্যবর্তী অবস্থার সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করেছে।

২০০০ সালের এপ্রিলে ডাকারে ১৬৪টি দেশের সরকার অন্যান্য অংশীদার প্রতিষ্ঠানসহ সম্মিলিতভাবে যে কর্ম পরিকল্পনার কাঠামো গ্রহণ করে তার মূল কেন্দ্রে ছিল সবার জন্য শিক্ষার ছয়টি লক্ষ্য অর্জন: প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার সম্প্রসারণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, তরুণ ও বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, সাক্ষরতার বিস্তার, শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের সমান সংখ্যায় অংশগ্রহণ ও সমতা এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি।

জাতীয় সরকারগুলো কি ইএফএ-এর প্রতি তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পেরেছে? কোন কোন অঞ্চল ও দেশগুলো সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি করেছে? কোথায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে? বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা অসুবিধাগ্রস্ত গোষ্ঠী ও অঞ্চলের শিশুদের জন্য? কোন নীতিগত উদ্যোগ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করছে এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধি করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কি পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়েছে?

ইএফএ এজেন্ডা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে পর্যাপ্ত সম্পদ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সরকারি নীতি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ গতিধারাগুলোর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ডাকার এজেন্ডার স্থায়ী প্রাসংগিকতা রয়েছে। তবে বৈশ্বিক এজেন্ডাগুলোতে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা রয়েই যায়।

বৈশ্বিক ধারায় শিক্ষা প্রভাবান্বিত

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ন: পাঁচজনের মধ্যে চারজন শিশুই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্মগ্রহণ করে। সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলোতে মোট জনসংখ্যার ৪২%, (যারা ১৫ বছরের নিচে) বাস করে। অনেক দেশই যারা সর্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে রয়েছে আগামী দশকগুলোতে সেসব দেশ ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক চাপের সম্মুখীন হবে।

২০০৮ সালের মধ্যেই বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন লোক) শহরে বাস করবে এবং এদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শহরের বস্তিগুলোতে বাস করবে। নগরে নবাগত বসবাসকারীদের প্রায় অর্ধেকই গ্রাম থেকে শহরে স্থান পরিবর্তনকারী লোকজন। শহরে আগমনকারী পরিবারের এবং বস্তিবাসী শিশুদের জন্য শহরে বিদ্যালয় খোলা দ্রুত নীতি বিষয়ক ইস্যু হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

স্বাস্থ্য: এইচ.আই ভি/এইডস, যক্ষা এবং ম্যালেরিয়া রোগে সারাবিশ্বে প্রতি বছর ৬ মিলিয়ন লোক মারা যায়, সবচেয়ে বেশি মারা যায় সাব-সাহারান আফ্রিকায়, শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ছে। নারীদেরই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইচ.আই ভি/এইডস এর বোঝা বহন করতে হয়। এইডস-এর কারণে ১৮ বছরের নিচে অনাথ শিশুদের সংখ্যা ২০১০ সালের মধ্যে ২৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। এইচ.আই ভি/এইডস এর কারণে শিক্ষক অনুপস্থিতি এবং মৃত্যু সরাসরিভাবে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং গুণগত মানের ওপর প্রভাব ফেলছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সুবিধা প্রদান, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং শিখনকে প্রভাবান্বিত করে, এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এগুলি অতি প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্য বৃদ্ধি : ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় (মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন প্রতি বছর গড়ে ১.৯% করে), দক্ষিণ এশিয়ায় (৪.৩%) এবং পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিকে সবচেয়ে বেশি (৭.২%)। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য সীমার (দৈনিক ১ ইউ.এস. ডলার এর কম) নিচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা ২৬০মিলিয়নের মত কমেছিল, যার অর্ধেকেরও বেশি কমতে শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ থেকে। যাহোক, চরম

ইএফএ এজেন্ডা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে যথাযথ রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সম্পদ থাকলে সরকারি পলিসি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে পারে।

অর্ধ বিলিয়নেরও বেশি লোক নাজুক হিসাবে চিহ্নিত ৩৫টি দেশে বাস করে।

দারিদ্র্য কমে যাওয়ার সঙ্গে প্রায়ই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য জড়িত হয়ে পরে। উন্নয়নশীল অঞ্চলের মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা সবেচেয়ে বেশি। তবে ১৯৯০ সাল থেকে এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তনশীল দেশগুলোতে এই পার্থক্য অনেক বেড়েছে। যদি শিক্ষার নীতিগুলো দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা না হয়, তা হলে নিম্ন মানের শিক্ষা ও নানাবিধ শিক্ষা ব্যবস্থা চলমান সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরো প্রকট করে তুলবে। শিক্ষার্থীদের সামাজিক পটভূমির কারণেই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের স্তরেও ব্যাপকভাবে বিভিন্নতা আসবে।

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উন্মেষ : কেবলমাত্র সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ছাড়া পৃথিবীর সব অঞ্চলেই ২০০৬ সালের মধ্যে সেবাখাত সবচেয়ে বড় কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র হয়ে দাড়িয়েছে। একটি নিবিড়-জ্ঞান নির্ভর বিশ্ব অর্থনীতির উদয় হচ্ছে যার জন্য উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তির চাহিদা বেড়ে চলেছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যা সমস্যা সমাধান এবং বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে তাই হচ্ছে উন্নয়নের ভিত্তি।

সংঘাতপূর্ণ নাজুক ও দুর্বল দেশসমূহ: বিশ্বজুড়ে সশস্ত্র সংঘাতের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এবং নানা জরিপে দেখা যায় যে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় দেশগুলোতে নাগরিক স্বাধীনতা ও মুক্তির নানাদিক উন্নত হচ্ছে। সুশীল সমাজগুলোও ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের শক্তি বাড়িয়ে ফেলছে। নাজুক ও দুর্বল দেশে দুর্বল প্রতিষ্ঠান/

পৃথিবী আবিষ্কার করছে ঃ জিবুতীতে একজন স্কুলছাত্রী গ্লোব পরীক্ষা করছে।

সংগঠন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ ও জাতিগত দ্বন্দ্ব এসব ইএফএ এজেন্ডাতে মুখ্য বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এক হিসাব অনুযায়ী অর্ধ বিলিয়নেরও বেশি লোক পঁয়ত্রিশটি দুর্বল দেশে (OECD উন্নয়ন সহযোগিতা কমিটি দ্বারা চিহ্নিত) বাস করে।

সাহায্য বাড়ানোর প্রচেষ্টা : দ্বিপক্ষীয় দাতাদের সরকারি উন্নয়ন সাহায্য Official Development Assistance (ওডিএ) ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে বাৎসরিক ৯% করে বৃদ্ধি পায়। তবে প্রাথমিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে ২০০৬ সালে ওডিএ ৫.১% হ্রাস পায়। যদিও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মোট ওডিএ সাহায্যের পরিমাণ ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে বৃদ্ধি পায়। মধ্য আয়ের দেশগুলো সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে মূলত ইরাকে বিশাল আকারের সাহায্য প্রদানের কারণেই। ২০০৫ সালের গ্লেনঈগলস শীর্ষ সম্মেলনে জি-৮ এর দেশগুলো সব উন্নয়নশীল দেশের জন্য ২০১০ সালের মধ্যে ওডিএ ৫০ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার বৃদ্ধি করার ঘোষণা দেয়। এর মধ্যে ২৫ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার আফ্রিকার সাহায্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যদি ঋণ মওকুফ ও মানবিক সাহায্যের কথা বাদ দেয়া হয়, তা হলে বলতে হবে ২০০৪ সাল থেকে আফ্রিকাতে সাহায্য অতি সামান্যই বেড়েছে এবং দাতাদের জন্যে ঐ মহাদেশে সাহায্য বাড়ানোর সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

শিক্ষা ও উন্নয়নে গবেষণার ধারা

- সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উন্নয়নমূলক সুবিধাদি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে, তবে/বৈষম্য দূরীকরণসহ শিক্ষা গ্রহণের মান বৃদ্ধির জন্য সম্পূরক নীতিমালার চাহিদার ওপর জোর দিয়েছে।
- স্নায়ুবিজ্ঞান বিষয় থেকে (Cognitive Neuroscience) দেখা যায় যে বৌদ্ধিক (cognitive) দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাক-শৈশবকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই ধরনের ফলাফলে ছোট শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত উদ্দীপনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়েছে যা প্রধানত প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের (ECCE) মাধ্যমে ঘটে।
- বিদ্যালয় হচ্ছে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্দীপনা যোগান দেয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ।
- উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে, পিতামাতাদের শিক্ষা এবং সাক্ষরতা, স্বাস্থ্যকর জীবন, কম প্রজননক্ষমতা এবং শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
- শিক্ষার সম্প্রসারণ সাধারনত কম বৈষম্য বুঝায় না। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্ষুদ্রজাতি থেকে আগত শিশুরা বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার সম্প্রসারণ থেকে সবচেয়ে কম উপকৃত হয়।
- গণিত ও ভাষা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ওপর পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কত বছর লেখাপড়া করেছে তার তুলনায় শিক্ষার গুণগত মান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।

শিক্ষা অধিকার সমর্থন

১৯৪৮ সনের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং পরবর্তীতে গৃহীত চুক্তিসমূহ শিক্ষায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশীয় সরকারদের তা সমর্থন করা সহ বাস্তবায়নের আইনগত ক্ষমতা দেয়। "Conventions on the Rights of the Child" (শিশু অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন) সর্বাপেক্ষা সমর্থিত শক্তিশালী মানবাধিকার চুক্তি যা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, এবং তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের প্রতি দৃঢ় সমর্থন বিভিন্ন সরকারকে তা জাতীয় আইনে পরিণত করতে এবং বাস্তবায়নে সাহায্য করে থাকে। তবে মোট ১৭৩টি দেশের সাম্প্রতিক বিবরণ অনুযায়ী ৩৮টি দেশে, প্রতি ৫টির মধ্যে ১টি দেশের সংবিধানে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। প্রতি পাঁচটিতে একটি দেশের স্থলে এই সংখ্যা হবে প্রতি তিনটিতে ১টি দেশ যদি উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপকে হিসাব থেকে বাদ দেয়া হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ২০০০ সাল থেকে ২৩টি দেশ আইনী ধারা প্রবর্তন করেছে। কিছু দেশ সম্পদ সংগ্রহের জন্য দেশীয় আইন প্রবর্তন করেছে ঃ ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে মৌলিক শিক্ষার জন্য রাজস্ব আয়ের সুনির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ রাখার বিধান রয়েছে।

১৯৪৮ সনের মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা এবং পরবর্তী চুক্তিসমূহ শিক্ষায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশীয় সরকারদের তা সমর্থন বা বাস্তবায়নের জন্য শক্তি যোগাতে আইনগত ক্ষমতা দেয়।

আন্তর্জাতিক ই এফ এ-এর প্রচেষ্টাসমূহ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যদল (সাক্ষরতা, মেয়েশিশু, এইচ আই ভি/এইডস) সামনে রেখে এবং সাহায্যের মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই জাতীয় উদ্যোগসমূহের সমকেন্দ্রিকতা বা একমুখীতা (Convergence) সার্বিকভাবে মৌলিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে রয়েছে: সবার জন্য শিক্ষার ছয়টি লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতির বিশ্লেষণ (অধ্যায়-দুই) ডাকার ঘোষণার পর থেকে বিশেষ করে অসুবিধাগ্রস্ত এবং ঝুকিপূর্ণ তথা বিপদগ্রস্ত গোষ্ঠীর জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি সর্ম্পকিত নানা উদ্যোগের পর্যালোচনা (অধ্যায় - তিন), শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নের নিরীক্ষা (অধ্যায়-চার) এবং উপসংহারে রয়েছে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের সম্ভাবনাসহ পলিসি এজেন্ডা (অধ্যায়-পাঁচ)।

চীনের একটি সাক্ষরতা ক্লাশে কয়েক প্রজন্মের শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রাথমিক শিক্ষা : যেসব অঞ্চলে ভর্তির হার কম ছিল সেসব অঞ্চলে ২০০০ সাল থেকে এক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা : অসম অগ্রগতি, অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য ন্যূনতম প্রবেশের সুযোগ

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুরা ঃ ২০০২ থেকে এদের সংখ্যা দ্রুত কমছে

নিম্নমানের শিক্ষা : একটি বৈশ্বিক সমস্যা বিশেষ করে যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে

অধ্যায় ২: ছয়টি লক্ষ্য ঃ আমরা কতদূর অর্জন করতে পেরেছি ?

বৈশ্বিক সাক্ষরতা : ক্ষুদ্র অর্জন তবে চীনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

ভৌগোলিক বৈষম্য : প্রাথমিক স্তরে ভর্তি বাড়া সত্ত্বেও তা প্রায়ই বিরাজমান

জেন্ডার অসমতা : কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে এখনও বৈষম্য তীব্র

শিক্ষক নিয়োগ : প্রাথমিক স্তরে ভর্তি বৃদ্ধির সংগে তাল মেলাতে পারছে না

দুই হাজার এবং দুই হাজার পনের সাল (যা ইএফএ অর্জনের নির্ধারিত সময়) এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই অধ্যায়ে ২০০৫ সালের বিদ্যালয় বছর পূর্ণ হওয়ার উপাত্ত ও তথ্য ব্যবহার করে সবার জন্য শিক্ষার ছয়টি লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়েছে। ডাকার ঘোষণার পর থেকে বিশ্বে ইএফএ অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিন্তু অসম অগ্রগতি হয়েছে। দেশগুলোর অভ্যন্তরেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক বৈষম্য বিরাজমান। এছাড়াও নিম্নমানের শিক্ষা একটি বড় সমস্যা।

লক্ষ্য ১: প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা ঃ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান

'সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সমন্বিত প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন'।

সুসংগঠিত প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়টি এখন বাধ্যতামূলক হয়ে পরেছে বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য।[১] সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ কার্যক্রমগুলো শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কল্যাণ এবং বৌদ্ধিক বিকাশকে উন্নত করে তোলে, এবং শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও টিকে থাকার জন্য ভালভাবে প্রস্তুত করে থাকে। এ জাতীয় কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের নানা প্রতিবন্ধকতা ও অসমতা দূরীকরণের মাধ্যমে ভাল অর্থনৈতিক ফলাফল বা রিটার্ণ পাওয়া যায়। যদিও সারা বিশ্বে ৫ বছরের নিচে শিশুদের মৃত্যুহার ১৯৯৫ সাল থেকে কমেছে (প্রতি ১০০০ জনে ৯২ থেকে কমে ৭৮ জন হয়েছে), কিন্তু এ হার সাব-সাহারান আফ্রিকাতে অনেক বেশি।

পাঁচ বছরের নিচে ২০০৫ সালে প্রায় ১০ মিলিয়ন শিশুর মৃত্যু হয়, যায় অধিকাংশই ছিল উন্নয়নশীল দেশের। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিশু পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে এ ধরনের বেশির ভাগ মৃত্যু ঠেকানো যেত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৫ বছরের নিচে প্রতি ৪ জনে ১ জন শিশু কম পুষ্টি এবং অপুষ্টিতে ভোগে। এ অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে শিক্ষার ওপরে, শিশুদের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়, কম হারে ভর্তি হওয়া এবং বেশি হারে ড্রপ-আউটের সম্ভাবনা থাকে।

তিন বছরের নিচে শিশুদের জন্য যে কার্যক্রমে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, এবং বৌদ্ধিক বিকাশের উপাদান থাকে তা শিশুদের কল্যাণ অর্থাৎ ভাল থাকার ওপরে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে থাকে।

১. বিস্তারিত দেখুন ২০০৭ প্রতিবেদন:

তিন বছরের নিচে শিশুদের জন্য যে কার্যক্রমে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, এবং বৌদ্ধিক বিকাশের উপাদান থাকে তা শিশুদের কল্যাণ অর্থাৎ ভাল থাকার ওপরে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে থাকে। এতদসত্ত্বেও বিশ্বের মাত্র ৫৩% দেশে এই বয়সী শিশুদের জন্য সরকারি ভাবে ইসিসিই কার্যক্রম রয়েছে। এই কাযক্রমগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে, মধ্য এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে। শ্রমবাজারে মহিলাদের ব্যাপক প্রবেশকেই আংশিকভাবে এসব কার্যক্রমের উৎপত্তির কারণ বলা যেতে পারে। বিশ্বের অন্য অংশগুলোতে দেশীয় সরকারগুলো খুব ছোট শিশুদের যত্ন ও শিক্ষাকে পরিবার কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব হিসাবে ভেবে থাকে। ফলশ্রুতিতে খুব কম দেশেই ইসিসিই কার্যক্রমের অর্থায়ন, সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় কাঠামো রয়েছে।

যদিও ইসিসিই কার্যক্রম থেকে দরিদ্রতর এবং গ্রামাঞ্চলের শিশুদের সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এসব কার্যক্রমে ভর্তি বা প্রবেশের সুযোগ তাদের সবচেয়ে কম।

চিত্র ২.১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মোট ভর্তি অনুপাত (GER): অঞ্চল ভেদে গড় হিসাব, ১৯৯৯ ও ২০০৫

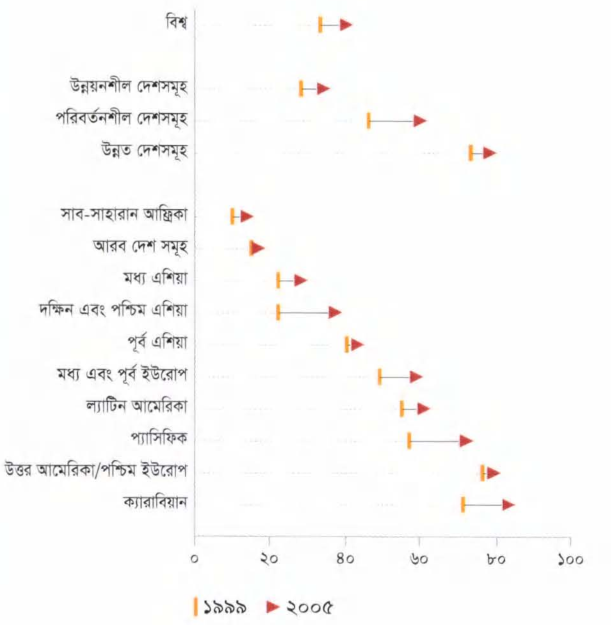

উৎস: অধ্যায় দুই : ইএফএ-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অসম অগ্রগতি

দেশীয় সরকারগুলো তিন বছর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করে এমন বয়সী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয়। সারা বিশ্বে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সাল সময়ের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিকৃত শিশুদের সংখ্যা ২০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০০৫ সালে ১৩২ মিলিয়ন হয়। এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে (যথাক্রমে ৬৭% এবং ৬১%)। অন্যদিকে চীনে প্রধানত ঐ বয়সী শিশুদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পূর্ব-এশিয়াতে ঐ পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে যায়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হারও বৃদ্ধি পায়, সারা বিশ্বে মোট ভর্তির হার (GER) ১৯৯৯ সালের ৩৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৪০% হয় (চিত্র ২.১)। আঞ্চলিকভাবে এই হারে ব্যাপক ব্যবধান দেখা যায়, যেমন সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ১৪%, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ৮৩%। প্যাসিফিক অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে (প্রতিটি অঞ্চলে ১৫% করে), এরপর রয়েছে ক্যারিবিয়ান (১২%), মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে (১০%)। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে পরের অঞ্চলগুলো ১৯৯০ সালের অবস্থা থেকে উন্নতি করেছে বা খারাপ থেকে ভাল অবস্থায় পৌঁছেছে। সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণের হার দেখা যায় উন্নত এবং পরিবর্তনশীল দেশগুলোতে, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান এবং প্যাসিফিক অঞ্চলে।

যে ৫০টি দেশে অংশগ্রহণের হার ৩০% এর নিচে তার এক-তৃতীয়াংশ দেশই হচ্ছে সাব-সাহারান আফ্রিকা ও আরব দেশে। তথাপিও বেশ কিছু দেশে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। মোট ভর্তির অনুপাত (GER) খুবই নিম্ন অবস্থান (base) থেকে দ্বিগুণ কিংবা ত্রিগুণও হয় যেমন, বুরুন্ডি, কংগো, ইরিত্রিয়া, মাদাগাস্কার এবং সেনেগালে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০০% এর ওপরে বৃদ্ধি পায় (সেনেগাল ও কংগো); অন্যত্র সরকার ফ্রি কিন্ডারগার্টেন চালু করে (ঘানা) কিংবা নতুন নতুন শিশু যত্নকেন্দ্র খোলার জন্য সহায়তা প্রদান করে (ইরিত্রিয়া)। যদিও ইসিসিই কার্যক্রম থেকে দরিদ্রতর এবং গ্রামাঞ্চলের শিশুদের সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে তবে এসব কার্যক্রমে ভর্তি বা প্রবেশের সুযোগ তাদের সবচেয়ে কম। শিক্ষার অন্যান্য স্তরের চেয়ে প্রাক-প্রাথমিকে জেন্ডার অসমতা কম, কারণ সাধারণত বিত্তশালী পরিবারের শিশুরাই এই স্তরে ভর্তি হয়। জেন্ডার প্যারিটি সূচক ২০০৫ এ সব অঞ্চলেই ০.৯০ এর কাছাকাছি কিংবা তার ওপরে ছিল। কিছু দেশে মেয়েদের বিপক্ষে ব্যাপক অসমতা (যেমন- চাদে ০.৪৮ ও মরক্কোতে ০.৬৫) থাকলেও ছেলেদের বিপক্ষেও অসমতা দেখা গিয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক স্বল্পতা

শিশুদের এবং শিক্ষক বা পরিচর্যাকারীর (Carer) মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই (interaction) হচ্ছে ইসিসিই কার্যক্রমের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মান নির্ধারক। শিশুদের সর্বাপেক্ষা সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অপেক্ষাকৃত ছোট ক্লাশ। সারা বিশ্বে ২০০৫ সালে প্রতি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য ২২ জন করে শিক্ষার্থী ছিল যা ১৯৯৯ সালের চেয়ে সামান্য বেশি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে ১২১টি দেশের মধ্যে ৪০% দেশে শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ঐ অঞ্চলে ৪০ : ১ এ পৌঁছেছিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা যা শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগের আরেকটি সূচক সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষক (PTR) অনুপাত অনেক বেশি ছিল : ঘানাতে এই অনুপাত ১৫৫ : ১ ছিল যা কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে ভর্তির ব্যাপকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠার সমস্যাই নির্দেশ করছে।

চিত্র ২.২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নেট ভর্তি অনুপাত, অঞ্চল ভেদে গড় হিসাব (NER), ১৯৯৯ ও ২০০৫।

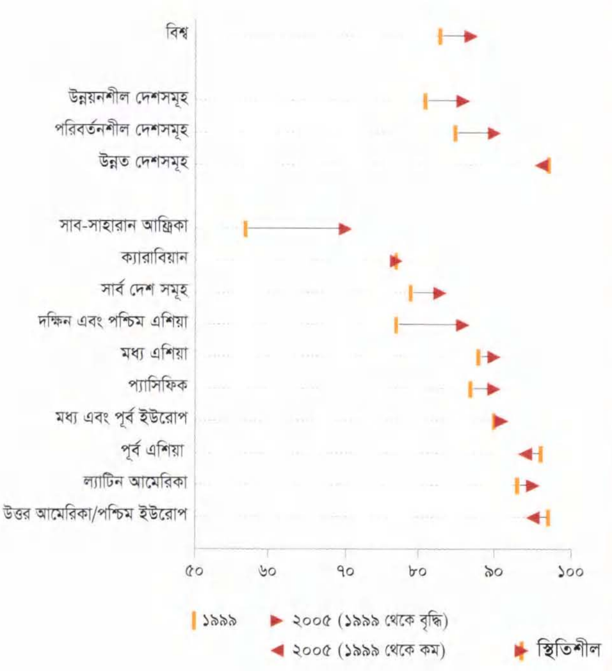

উৎস: অধ্যায় দুই : ইএফএ-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

লক্ষ্য ২: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ঃ অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু এখনও সাফল্যের কাছাকাছি নয়

'২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশু, বিপদ বা কষ্টকর পরিস্থিতির শিশু, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মানসম্মত অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশ তথা ভর্তি এবং সমাপ্ত করা নিশ্চিতকরণ।'

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দিকে বিশ্ব দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। এর আংশিক কারণ হচ্ছে কিছু কিছু দেশে বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুদের সংখ্যা ১৯৯৯ ও ২০০৫ সালের মধ্যে ৪% বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০ মিলিয়ন থেকে ১৩৫ মিলিয়ন হয়েছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ অর্জন রেকর্ড করা হয়েছে সাব-সাহারান আফ্রিকায় (৪০%), আরব দেশগুলোতে (১১.৬%), এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (৯.৪%)। অন্যান্য অঞ্চলে কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে প্রজনন ক্ষমতার নিম্ন গতিধারা।

২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন করতে হলে ২০০৯ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বয়সের সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। ভর্তির গতিধারা ধনাত্মক। যেসব দেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল সেসব দেশেও নতুনদের ভর্তি হার বাড়ছে। তবে কিছু দেশ, বেশির ভাগই সাব-সাহারান আফ্রিকা ও আরব দেশে আগামী দশকে ইউ পি ই (UPE) অর্জনে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ছে কিন্তু তা সর্বজনীন হতে এখনও অনেক দূরে (চিত্র ২.২)। সারা বিশ্বে ২০০৫ সালে ৬৮৮ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল যা ১৯৯৯ থেকে ৬.৪% বেড়েছে। ডাকার ঘোষণার পর ভর্তি বেড়েছিল সাব-সাহারান আফ্রিকাতে (২৯ মিলিয়ন অথবা ৩৬% বৃদ্ধি), দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে (৩৫ মিলিয়ন বা ২২%)। অন্যদিকে আরব দেশগুলোতে বৃদ্ধির ধারা ডাকার সম্মেলনের আগের মতই ছিল। পরবর্তী দশকে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের সংখ্যা ২২% এবং আরব দেশগুলোতে ১৩% বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য অনেক অঞ্চলেই ভর্তি সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে অথবা কমে গেছে। বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের সংখ্যা কমার জন্য এটা হয়েছে।

পরবর্তী দশকে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

আরব দেশ, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে, গড় নেট ভর্তির অনুপাত (NER) ৯০% এর নিচে, তবে জিবুতি

(৩৩%) এবং পাকিস্তানে (৬৮%) আরো কম। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা সাব-সাহারান আফ্রিকাতে, যেখানে ৬০% এরও বেশি দেশে এই হার ৮০% এর নিচে এবং এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি দেশে এ হার ৭০% এর কম। অধিকাংশ দেশে যেখানে ১৯৯৯ অথবা ২০০৫ সালে নেট ভর্তি অনুপাত ৯৫% এর নিচে ছিল, ডাকার সম্মেলনের পরে সেসব দেশে বৃদ্ধির ধারা যথেষ্ট বেড়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের ভর্তির জন্য সরকারি নীতিসমূহ (স্কুল ফি মওকুফ করা) প্রবর্তন করার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। অনেক দেশেই যেখানে ১৯৯৯ সালে ভর্তির হার সবচেয়ে কম ছিল, সেখানে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।

সুযোগের বৈষম্য ঃ শিক্ষায় অবিচার/অন্যায্যতা (inequity)

ডাকার সম্মেলনের পরে কোন দেশে, কোন অঞ্চলে, প্রদেশ বা রাজ্যে ভর্তি বৃদ্ধির হার একই মাত্রায় (uniform) হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, নেপালে পশ্চিম এবং দূর পশ্চিমাঞ্চলে নেট ভর্তির হার খুব বেশি (৯৫% এর ওপরে), অন্যদিকে পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের কিছু অংশে অনেক কম, ৬০% এর নিচে। গিনির রাজধানী কোনাক্রী এলাকার প্রায় সব শিশুই ভর্তি হয়েছে, কিন্তু বাইরের জেলাগুলোতে ভর্তির অনুপাত ৫০% এরও নিচে।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে পার্থক্য বা বৈষম্য কি কমে যাচ্ছে ? নেট ভর্তির অনুপাত (NER) বৃদ্ধি এবং ভৌগোলিক বৈষম্যের মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট যোগসূত্র নেই। ব্রাজিল, বুরকিনা-ফাসো, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালি, মরক্কো, মোজাম্বিক, নাইজার এবং তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্রে নেট ভর্তি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে ভৌগোলিক/আঞ্চলিক বৈষম্য কমে যাওয়ার সম্পর্ক লক্ষ করা যায়, তবে বাংলাদেশ, বেনিন, ইথিওপিয়া, গাম্বিয়া, গিনি, ভারত, কেনিয়া, মৌরিতানিয়া এবং জাম্বিয়াতে এই বৈষম্য বেশি কমেছে। একই প্রকার নেট ভর্তির হার (NER) থাকলেও দেশগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রের বৈষম্য থাকতে পারে, ইথিওপিয়া ও নাইজেরিয়ায় ব্যাপক বৈষম্য থেকে ঘানার কম বৈষম্য পর্যন্ত।

গ্রামাঞ্চল বা দূরান্তর এলাকার পরিবারগুলো মূলত দরিদ্রতর এবং সামাজিকভাবে বড় বেশি প্রান্তিক অবস্থানে থাকে, যাদের মানসম্পন্ন মৌলিক শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ খুবই কম। চল্লিশটি দেশের খানাভিত্তিক জরিপে দেখা যায় যে ৩২টি দেশেই শহরাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের নেট উপস্থিতির হার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশি। যাহোক 'নগরসুবিধা' সব শিশুদের জন্য নয়। বিশেষ করে যেসব শিশু বস্তিতে বেড়ে উঠছে। কিছু কিছু দেশে যেমন ব্রাজিল, গুয়াতেমালা, তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র, জাম্বিয়া, জিম্বাবুইএর বস্তিগুলোতে ভর্তির হার কমে গেছে।

সাব-সাহারান আফ্রিকার কিছু দেশের খানাভিত্তিক জরিপে দেখা যায় যে শহর বা গ্রামাঞ্চলে যেখানেই হোক দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম।

বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে

২০০৫ সালে ৭২ মিলিয়নের কিছু বেশি সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী শিশুরা প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল, যা ১৯৯৯ সালে ৯৬ মিলিয়ন সংখ্যার থেকে দ্রুত কমে গেছে। এই হ্রাসকৃত সংখ্যা দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (৩১ মিলিয়ন থেকে নেমে ১৭ মিলিয়ন হয়েছে) এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে (৪২ মিলিয়ন থেকে ৩৩ মিলিয়ন হয়েছে) লক্ষণীয়। এই দুই অঞ্চলে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা যথাক্রমে সব শিশুদের ২৪% এবং ৪৫%। এই কমে যাওয়া দ্রুত হয়েছে ২০০২ সাল থেকে (১৯৯৯ সালে ১৯.২ মিলিয়ন এর সাথে ২০০২ সালের ৫.২ মিলিয়নের সঙ্গে তুলনা করে এটা বলা যায়)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মুখে এই উৎসাহব্যঞ্জক ধারায় প্রতিফলিত হয় যে বিশ্বজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

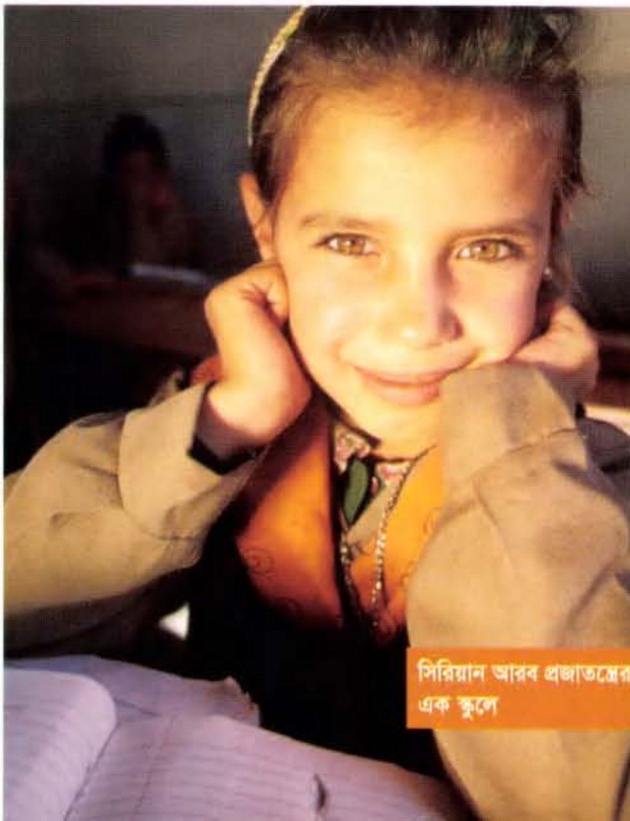
সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের এক স্কুলে

পৃথিবীব্যাপী একটি গতিবেগ তৈরি হয়েছে, যা এখন কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভর করছে। সম্মিলিতভাবে সারা বিশ্বের ২৭% বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশু ভারত, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তানে বাস করে। এর সাথে অন্য ৭টি দেশের ১ মিলিয়নেরও বেশি বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা (বুরকিনা-ফাসো, আইভরি কোস্ট, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, মালি, নাইজার ও ভিয়েতনাম) যোগ করলে তা ৪০% এ দাঁড়ায়। যে ৩৫টি দেশ নাজুক দেশ হিসাবে চিহ্নিত সেসব দেশে ২০০৫ সালে বিশ্বের ৩৭% বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুরা বাস করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এদের ভর্তি করা বা বিদ্যালয়ে এদের স্থান করে দেওয়া খুবই মুশকিল হবে (মানচিত্র ২.১)।

প্রায় ১৬% এর মত বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু প্রথম দিকে ভর্তি হলেও সমাপ্ত করার পূর্বেই তারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। আরো ৩২% শিশু শেষ পর্যন্ত বিলম্বে ভর্তি হয়েছিল। প্রধানত দরিদ্র পরিবার থেকে আগত, গ্রামে বসবাসকারী কিংবা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেনি এমন মায়েদের শিশু সন্তানদের বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা ঘটার সম্ভাবনা বেশি। বিদ্যালয় বহির্ভূতদের মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যা ১৯৯৯ এবং ২০০৫ এর মধ্যে কিছু কমে যায় (৫৯% থেকে ৫৭%)। মেয়ে শিশুরা এক্ষেত্রে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে (৬৬%) এবং আরব দেশগুলোতে (৬০%) খুবই

পৃথিবীব্যাপী একটি গতিবেগ তৈরি হয়েছে যা এখন মাত্র কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভর করে।

মানচিত্র ২.১: বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের নেট ভর্তি অনুপাত বিষয়ক চ্যালেঞ্জ, ২০০৫

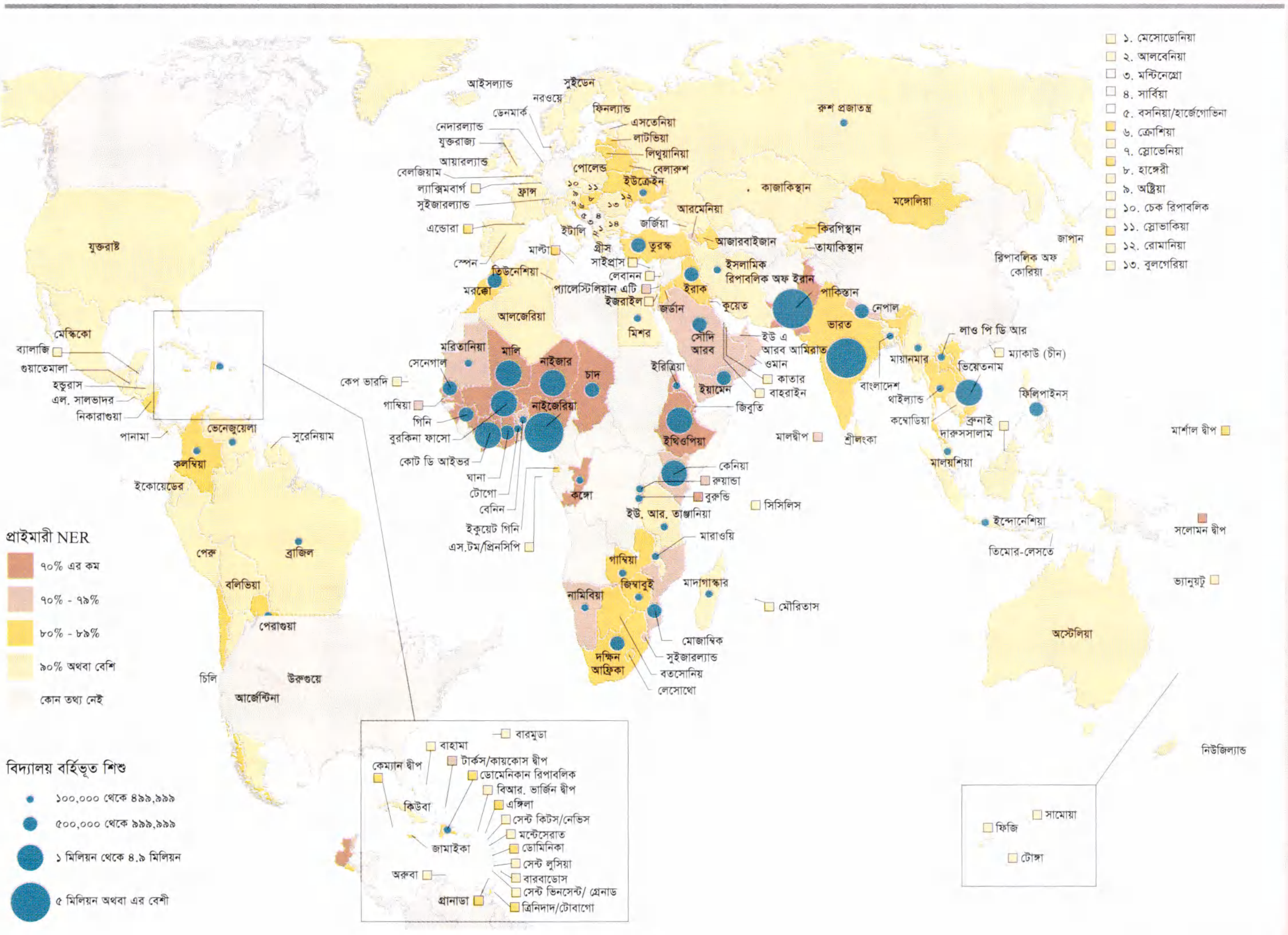

মানচিত্রে যে সীমানা এবং নাম দেখান হয়েছে তা সরকারিভাবে ইউনেস্কোর সমর্থিত বা গৃহীত নয়। জাতিসংঘের মানচিত্র ভিত্তিক।

উৎসঃ অধ্যায়-২ঃ পূর্ণাঙ্গ ইএফএ প্রতিবেদন।

অসুবিধাগ্রস্ত। সবশেষে, প্রতিবন্ধীতাও বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গড় ৭টি উন্নয়নশীল দেশের কেস-স্টাডিতে দেখা যায় যে একজন স্বাভাবিক/নর্মাল শিশুর তুলনায় একজন প্রতিবন্ধী শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার সম্ভাবনা প্রায় অর্ধেক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া

যেখানে শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তির হার বেশি, সেখানে ঝরে পড়ার হারও বেশি। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি পুনরাবৃত্তি ঘটেছে (মিডিয়ানে ১৫%), তারপরে রয়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান (প্রতিটি দেশে ৫% করে)। বেশির ভাগ অঞ্চলেই গ্রেড-১ এ এই হার সর্বোচ্চ হয়, (যেমন নেপালে ৩৭%, গণপ্রজাতন্ত্রী লাওএ ৩৪%, বুরুন্ডি, কমোরস, ক্রান্তিক গিনি এবং গ্যাবন, এসব দেশে ৩০% এর ওপরে, ব্রাজিলে ২৭% এবং গুয়াতেমালায় ২৪%), এর আংশিক কারণ হচ্ছে দরিদ্র দেশ বা অঞ্চলগুলোতে শিশুরা প্রায়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, এবং প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমে কদাচিৎ অংশগ্রহণ করে থাকে। তা সত্ত্বেও ১৯৯৯ এবং ২০০৫ এর তথ্য অনুযায়ী এই দুই সালের মধ্যবর্তী সময়ে পুনরাবৃত্তির হার দুই-তৃতীয়াংশ দেশে কমেছে। কিছু দেশ অটো-প্রমোশন নীতি চালু করছে (ইথিওপিয়া), অন্যকিছু দেশে নতুন কারিকুলাম (মোজাম্বিক) প্রবর্তনের ফলে পুনরাবৃত্তির হার কমে যাওয়া লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়াদ শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া একটি উদ্বেগের কারণ। ২০০৪ সালে যেসব দেশের তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার অর্ধেক দেশে যেসব শিশুরা গ্রেড-১ এ ভর্তি হয়েছিল তাদের ৮৭% এর ও কম শিশু শেষ গ্রেডে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। যাকে বলা হয় টিকে থাকার হার। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে শেষ গ্রেড পর্যন্ত টিকে থাকার মিডিয়ান পয়েন্ট ৭৯% পর্যন্ত নেমেছে) এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় এই মান সবচেয়ে কম (৬৩%)। অন্যদিকে কিছু দেশে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের অর্দ্ধেক এরও কম শিশু শেষ গ্রেডে পৌছে থাকে। এই দৃশ্যপটের অন্য অবস্থানে থাকা আরব দেশগুলোর মিডিয়ান পয়েন্ট ৯৪%, মধ্য এশিয়ায় ৯৭%, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, এবং উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে-এই মান ৯৮% এর ওপরে।

তথ্য অনুযায়ী বেশির ভাগ দেশেই ১৯৯৯ ও ২০০৫ এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ গ্রেডে পৌঁছায় এমন শিশুদের শতকরা হার বৃদ্ধি পায়। অন্য কোথাও নেট ভর্তির হার বৃদ্ধি পেলেও ৫ম গ্রেডে পৌঁছায় এমন শিশুদের সংখ্যা কমে যায়। এতে বোঝা যায় যে শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ করা যেমন কঠিন কাজ, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা পর্যন্ত তাদের বিদ্যালয়ে টিকিয়ে রাখাও কঠিন।

তথ্য অনুযায়ী বেশির ভাগ দেশেই ১৯৯৯ ও ২০০৫ এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ গ্রেডে পৌঁছায় এমন শিশুদের শতকরা হার বৃদ্ধি পায়।

আবার যেসব শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বশেষ গ্রেডে পৌঁছে, সবাই তা সমাপ্তও করে না বা করতে পারে না-ব্রুনাই দারুসসালাম, বুরুন্ডি, গ্রানাডা, নেপাল, নাইজার, পাকিস্তান এবং সেনেগাল এসব দেশে এক্ষেত্রে ২০ শতাংশ পয়েন্ট এরও বেশি ব্যবধান রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পরবর্তী পর্যায়

সবার জন্য শিক্ষায় অগ্রগতি মনিটর করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকের হিসাব মিলিয়ে নেয়া বা স্টক-টেকিং গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করছে, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য চাহিদা বাড়ছে। অধিকাংশ সরকারই প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করাকে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করে। বিশ্বজুড়ে প্রতি চারটির মধ্যে তিনটি দেশে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। জেন্ডার প্যারিটির লক্ষ্যের মধ্যে দেশগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ে প্যারিটি নিশ্চয়তা বিধানের আহ্বান রয়েছে।

২০০৫ সালে, বিশ্বজুড়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৫১২ মিলিয়নের মত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল যা ১৯৯৯ সাল থেকে ৭৩ মিলিয়ন বেশি (১৭%)। এই প্রবৃদ্ধি হয়েছিল মূলত সাব-সাহারান আফ্রিকা (৫৫%), দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, আরব দেশসমূহ (২৫% প্রতিটিতে) এবং পূর্ব এশিয়াতে (২১%) ভর্তি বৃদ্ধির ফলে।

নব্বই দশকের আরম্ভ থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষায় বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণের হার তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। গড়ে মাধ্যমিকের মোট ভর্তি অনুপাত (GER) ছিল ১৯৯১ সালে ৫২%, ১৯৯৯ সালে ৬০% এবং ২০০৫ সালে ৬৬%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা এর বেশি ভর্তি হয় ল্যাটিন আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে। গড় হিসাবে কম ভর্তি হয়ে থাকে সাব-সাহারান আফ্রিকা (২৫%), দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া (৫৩%) এবং আরব দেশগুলোতে (৬৬%)। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলো সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায়ই অর্জন করে ফেলেছে, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়াতে মাধ্যমিক পর্যায়ে নেট ভর্তির অনুপাত (NER) তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

বয়স্কদের শিখন সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভারত এবং সেনেগাল CSOs এর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। সেনেগালের 'faire-faire' এ্যাপ্রোচ এই অঞ্চলের অনেক দেশেই সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপকগণকে এ কার্যক্রমের নকশা তৈরি এবং তা প্রয়োগ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও এ ধরনের কার্যক্রমে ভর্তি খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হলো অপর্যাপ্ত সরকারি তহবিল এবং সরকারি পরিবীক্ষণের অভাব। ব্রাজিল অনেকগুলো কার্যক্রম শুরু করেছে যার ফলে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন যুবা এবং বয়স্ক লোক উপকৃত হয়েছে। পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্রসমূহ বিস্তার লাভ করেছে। এসব কেন্দ্র শিক্ষার সাথে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী যুক্ত করার ফলে সাক্ষরতার অনেক উন্নতি হয়েছে।

শিখন উন্নয়ন

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সকল দেশই বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। শিখনকে সমৃদ্ধ করার জন্য কোন একক কৌশল নেই, কিন্তু মূখ্য উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত শিখন সময় এবং সম্পদ, দক্ষ এবং প্রেষণাপ্রাপ্ত (motivated) শিক্ষক এবং কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতি।

যে সকল দেশ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য এ সকল উপাদানকে একত্রিত করে একটি ব্যাপক এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যাম্বোডিয়া, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (বক্স ৩.২)।

স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিখন সময় এবং পাঠ্যপুস্তকসমূহ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্য কর্মসূচি কার্যক্রম পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে এবং তাদের বিদ্যালয়ে রাখতে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশ এবং চিলিতে দেখা যায় যে তারা অনুপস্থিতি এবং ঝরে পড়া কমাতে পেরেছে এবং ভর্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বত্রিশটি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশে শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশনের সাথে বাড়িতে রেশন দেয়ার ব্যবস্থা করার ফলে ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিক উপস্থিতির যোগসূত্রও রয়েছে।

বিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনার বিরুদ্ধে সমন্বিতভাবে প্রতিক্রিয়া করা হয় না। কয়েকটি আফ্রিকান এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের সাড়া দেওয়া এবং তাদের কথা শোনার ধৈর্য এবং বিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ, বিদ্যালয়ঘটিত সহিংসতা দূরীকরণে কার্যকর। সম্প্রদায়গুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করলে জেন্ডারভিত্তিক নিপীড়ন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। অনেক দেশেই শিখনের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব, যদি তারা বৎসরে সরকারিভাবে শিক্ষাদানের সময় প্রায় ৮০০ ঘণ্টা ধার্য করে এবং এর সবটুকুই শিখনের কাজে ব্যয় হবে এটা নিশ্চিত করতে পারে। বেশি করে পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহও শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফলের সাথে জড়িত, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে। কয়েকটি দেশ (উদাহরণস্বরূপ, ক্যামেরুন, ইথিওপিয়া, গিনি, ভারত, মালয়েশিয়া, মরক্কো, নেপাল) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থানসমূহে অথবা নির্দিষ্ট দলের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা শুরু করেছে। অন্যান্য অনেকে পাঠ্যপুস্তক বাজারজাত করার ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করেছে এবং এতে তারা বিভিন্ন ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে।

দক্ষ এবং উদ্বুদ্ধ শিক্ষক মন্ডলী

ইএফএ-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারগুলোর উচিত শিক্ষকদের অবস্থা, মনোবল এবং পেশাগত মান এর

বক্স ৩.২: শিক্ষার গুণগত মানের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ

ক্যাম্বোডিয়া ২০০০ সালে জরুরিভিত্তিক কার্যক্রমের প্রোগ্রাম শুরু করে, যার লক্ষ্য ছিল দরিদ্র পরিবারগুলোর বিদ্যালয়ের খরচ কমানো, মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদেরকে স্কলারশীপ দেওয়া, দরিদ্র বিদ্যালয়গুলোতে সকালের নাস্তা দেওয়া, এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। এই কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষকতা করার জন্য উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মেক্সিকো গ্রামাঞ্চলের ছড়িয়ে পড়া সম্প্রদায়সমূহ এবং স্বদেশীয় জনগণের উন্নতির লক্ষ্যে কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করেছিল। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ইসিসিই-এর ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয় কাঠামো উন্নয়ন, শিখন সামগ্রীর সরবরাহ, শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি রোধে এবং ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য পুরস্কার প্রদান। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে স্বদেশী এবং যারা স্বদেশী নয় এ উভয় শ্রেণীর শিশুদের মাঝে একই শ্রেণীতে একাধিক বৎসর থাকা এবং শিখনফল অর্জনে অসমতার পার্থক্য ৩০% পর্যন্ত কমে গিয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা জেলা উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম (১৯৮৯-২০০৩) চারটি প্রদেশে ১ম থেকে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান শিক্ষা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিখন সম্পদের ব্যবস্থাসহ ধারণ ক্ষমতার উন্নয়ন (capacity development)। মূল্যায়নে দেখা যায় যে, গ্রেড ৩ এ পঠন এবং গণনার ক্ষেত্রে সফলতা এসেছে

উন্নয়ন ঘটানো, যার ওপর ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন গুরুত্ব আরোপ করেছে। পূর্বের রিপোর্টগুলো এর জন্য কৌশলসমূহের বিশ্লেষণ করেছে (বক্স ৩.৩)। যখন ১৯৯৯ এবং ২০০৫ সাল এর মধ্যবর্তী সময়ে আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চল এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেক বেশি সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, তখন সে প্রচেষ্টা এই সময়ের ভর্তি বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। শিক্ষকের স্বল্পতা দূরীকরণে এবং খরচ কমাতে অনেক সরকারই চুক্তিতে অস্থায়ীভাবে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেয়। চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সরকারি চাকুরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত নিয়মিত কর্মচারীদের তুলনায় বেতন অনেক কম পান এবং তারা অসুস্থতার জন্য কোন কিছু পান না এবং অবসরভাতার অধিকারও তাদের নেই।

যেসব দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, সেসব দেশে এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

যেসব দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, সেসব দেশে এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০২ সালে ক্যামেরুনে সকল শিক্ষাবিদদের মধ্যে ৬৫% এবং সেনেগালে ৫৬% ছিলেন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক। ঐ দুটো দেশে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (PTRs) এখনও ৪০.১। তেরটি ফরাসি ভাষী জনপদ অধ্যুষিত সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশের তথ্যে দেখা যায় যে, নয়টিতে ৫০% এরও বেশি চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তাদের মর্যাদা সরকারি চাকুরিতে শিক্ষকদের থেকেও বেশি, এসব শিক্ষকদের এক মাসেরও কম প্রশিক্ষণ রয়েছে অথবা একেবারেই প্রশিক্ষণ নেই।

বক্স ৩.৩: পেশার প্রতি শিক্ষকদের আকর্ষিত করা

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতা শিথিলকরণ (মোজাম্বিক)।
- শিক্ষক-প্রশিক্ষণের উপায়কে আরো নমণীয় করা (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- প্রারম্ভিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ চক্রকে কমিয়ে আনা (ঘানা, গিনি, মালাওয়ি, মোজাম্বিক, উগান্ডা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী তাঞ্জানিয়া।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতার সাথে পূর্ণকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমন্বয় সাধন (কিউবা, যুক্তরাজ্য)।
- দূর শিক্ষণ মডেলের ব্যবহার (আফ্রিকার গ্রামাঞ্চল, ভারত)।
- পারদর্শিতা এবং প্রেষণা বৃদ্ধির জন্য পুরস্কার এবং প্রেষণা যার মধ্যে রয়েছে (ক) শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত বেতন, অন্যদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সত্যিকার অর্থে এবং (খ) যথার্থ কাজের পরিবেশ।
- জীবনব্যাপী শিখন কৌশল এবং পেশাগত কার্যক্রমের যোগানদান (চীন, শ্রীলংকা)।

চাদ, মৌরিতানিয়া এবং টোগোতে চার ভাগের তিন ভাগ অথবা তার থেকেও বেশি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণ নেই অথবা অল্প প্রশিক্ষণ রয়েছে। যারা স্থায়ী শিক্ষক তাদের তুলনায় এদের বেতন চার ভাগের এক ভাগ অথবা অর্ধেক।

শিখনে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের প্রভাব সম্পর্কে মিশ্র এবং সীমিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায় শিক্ষকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়, সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের টেস্ট স্কোরে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়, যদিও এটা সবক্ষেত্রে ঘটে না। সরকারি শিক্ষকদের তুলনায় অনুপস্থিতির হার একই হয় অথবা কিছুটা বেশি হয়, কিন্তু এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দীর্ঘ সময়ের জন্য একবারে ভিন্ন শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে দুই দল শিক্ষকের চাকুরি বজায় রাখা কি সম্ভব? সরকারের জন্য এটি একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাদানে নমনীয়তা এবং স্থানীয় প্রতিক্রিয়া রক্ষার জন্য নীতিমালার কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন যেখানে নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষার মানের সাথে কোন সন্ধি করা চলে না। অবশেষে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং নিয়মিত শিক্ষকদের একই পেশার ধারায় আনা প্রয়োজন। যেমন মালি, সেনেগাল এবং ভারতের কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষক নিয়োগ

অনেক দেশে যেখানে উচ্চ শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (PTRs) শিক্ষক স্বল্পতা নির্দেশ করে সেখানে এর সাথে তুলনামূলকভাবে বিদ্যমান থাকে ভৌগোলিক বিরাট বৈষম্য (উদাহরণস্বরূপ, এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, ক্যাম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক, উগান্ডা, গণপ্রজাতন্ত্রী তাঞ্জানিয়া)। অনেক কারণেই শিক্ষকগণ শহরে থাকতে পছন্দ করতে পারেন। এর বেশির ভাগ কারণই হলো জীবনযাত্রার মান, কাজের পরিবেশ, পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদি পাওয়ার সুযোগ। গ্রামাঞ্চলে, সাংস্কৃতিক এবং নিরাপত্তার পরিস্থিতি মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা।

ভৌগোলিক বৈষম্য কমানোর জন্যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। তুরস্কে ২০০০ সালে একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে তিন থেকে চার বৎসর পর্যন্ত থাকতে হয়। চীনে যদি নতুন গ্রাজুয়েটেরা তিন বৎসর গ্রামাঞ্চলে চাকুরি নিতে সম্মত হন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন তাদের মওকুফ করা হয় এবং তারা এক বৎসর মাস্টার্স পর্যায়ের কোর্সসমূহ বিনা বেতনে পড়তে পারেন। লেসোথো এবং নাইজেরিয়াতে শিক্ষকগণ

যারা গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে রাজী হন, তাদেরকে বোনাস অথবা কষ্টের জন্য ভাতা প্রদান করা হয়। যাহোক, নাইজেরিয়ায় অর্থ প্রদান বিলম্বিত হওয়ায় এ নীতিমালা ভীষণভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং এর ফলে ব্যাপকভাবে গ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভাটা পড়েছে।

শিক্ষণ এবং শিখন

শ্রেণীকক্ষের অনুশীলন শিক্ষণ এবং শিখনকে প্রভাবিত করে। শিক্ষাক্রম, শিশুদের মাতৃভাষার ব্যবহার, পরিমাপ এবং আই.সি.টি. এর সুবিধা গ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম

দেশীয় কেইসস্টাডি যেগুলো এই প্রতিবেদনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে শ্রেণীকক্ষের মিথষ্ক্রিয়া (interaction) আরো বেশি গতিশীল এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রীক হওয়ার জন্য শিক্ষাক্রমকে পরিমার্জন করতে হবে। 'chalk and talk' পদ্ধতি থেকে সরে আসার জন্য আবিষ্কারভিত্তিক শিখন পদ্ধতির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এভাবে শিখনফলের অর্জনে শুধুমাত্র ঘটনা এবং তথ্য মুখস্থের চাইতে অনেক বেশি জানা যায়। যে সকল দেশ ১৯৯৯ সাল থেকে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, মরক্কো এবং তুরস্ক। পর্যাপ্তভাবে কাঠামোবদ্ধ শিক্ষণ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেটা বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরগুলোতে সাক্ষরতা অর্জনের মত শিক্ষার্থীদেরকে মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করে।

এইচআইভি/এইডস শিক্ষা

সম্প্রতিকালে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো এইচআইভি/এইডস শিক্ষা। আঠারোটি স্বল্প আয়ের দেশের সার্ভেতে দেখা যায় যে, প্রায় সব দেশেই এইচআইভি/এইডস শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু এর প্রয়োগ সীমিত। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যালয়ভিত্তিক এইচআইভি/এইডস কোর্সগুলোর ওপর পৃথক কয়েকটি জরিপে দেখা যায় যে এইচআইভি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধিতে এর ভীষণ প্রভাব রয়েছে। এ ধরনের কোর্সের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন, যা এখনও সীমিত।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণের ক্ষেত্রে যেখানে বহু ভাষা এবং মাতৃ ভাষায় প্রারম্ভিক শিক্ষণ দেওয়ার জন্য এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, সে ক্ষেত্রেও কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

দ্বিভাষী এবং বহুভাষী শিক্ষণের উন্নতি ঘটান

গবেষণার মাধ্যমে বার বার দেখা গিয়েছে যে, শিশুরা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে দ্রুত ভাষা এবং জ্ঞানমূলক দক্ষতা অর্জন করে এবং এগুলোকে তারা বৃহত্তর পরিসরে জাতীয় এবং আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার শিখন ক্ষেত্রে যেখানে বহুভাষা এবং মাতৃভাষায় প্রারম্ভিক শিক্ষাদান দেওয়ার জন্য এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে, তবু সে ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ক্যাম্বোডিয়া পাইলট প্রকল্পগুলোতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ব্যবহার শুরু করেছে। জাম্বিয়ার প্রাথমিক পঠন কার্যক্রম, বিদ্যালয়ের প্রথম তিন বৎসর মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। ভারত দৃঢ়ভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নীতিমালাকে সমুন্নত রেখেছে। দ্বিভাষা ও বহুভাষা তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিখনের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, কিন্তু দেশগুলোকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে মাতৃভাষায় দক্ষ পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন ভাষার পর্যাপ্ত পরিমাণ শিখন সামগ্রী পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার শিখন ক্ষেত্রে যেখানে বহুভাষা এবং মাতৃভাষায় প্রারম্ভিক শিক্ষাদান দেওয়ার জন্য এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে, তবু সে ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

পরিমাপের বা মূল্যায়নের উন্নয়ন

মূল্যায়ন/পরিমাপ সরকারকে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। জাম্বিয়ার যেসব বিদ্যালয়ে অর্জন অনেক নিচে, সেখানে জাতীয় পরিমাপের মাধ্যমে শিখন সামগ্রী সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। যাহোক পুরস্কার এবং অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিমাপের ব্যবস্থাকে বেঁধে দেওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ। যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিকে অতিরঞ্জিত করে দেখাতে পারে অথবা যে সকল শিক্ষার্থী কম প্রস্তুত তাদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারে। অনেক দেশ (মালাওয়ি, নামিবিয়া, সোয়াজিল্যান্ড) শিক্ষার্থীদের জন্য অবিরত পরিমাপের ব্যবস্থা করছে, যার সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মিত ফিডব্যাক (feedback) দিতে পারবেন। এটাকে কার্যকর করতে হলে পরিমাপকে অবশ্যই শিক্ষাক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। শিক্ষকরা যাতে সুষ্ঠ ভাবে পরিমাপ করতে পারেন, সে জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পিতামাতাকে তাদের সন্তানের অগ্রগতি অথবা অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

আইসিটি (ICT) : শিক্ষণের জন্য উদ্ভূত এক হাতিয়ার

শ্রেণীকক্ষে শিখন বিজ্ঞান উদ্ভাবন এবং দূর শিক্ষার ক্ষেত্রে ICT এর ব্যবহার বেশ প্রসার লাভ করেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে লক্ষ লক্ষ নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, চাকুরি পূর্ববর্তী এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই এটা সহায়তা করতে পারে। ল্যাটিন আমেরিকার দশটি দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য ICT ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে, কলেজে, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

ইনস্টিটিউশনে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা রাখার জন্য ভারত সর্বপ্রথম পৃথিবীর শিক্ষা স্যাটেলাইট EDUSAT প্রবর্তন করে। পুরনো প্রযুক্তিগুলোও আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যান্যদের মধ্যে ব্রাজিল, ভারত এবং মেক্সিকো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রসার ঘটানোর জন্য রেডিও এবং টেলিভিশনের সহায়তা নিয়েছে।

নতুন শিখন মাধ্যম যেগুলো আরো বেশি মিথস্ক্রিয়া (interactive) ঘটায় এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করে, সেগুলোর মধ্যে ICT এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিনিময়ের জন্য বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যোগসূত্র ঘটানো সম্ভব। সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে বিদ্যালয়ের নেটওয়ার্কের প্রসারণ ঘটেছে। School Net Africa বিশটিরও বেশি আফ্রিকান দেশকে সম্পৃক্ত করেছে। অন্যদিকে আফ্রিকার উন্নয়নে যাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে তারা ২০২০ সালের মধ্যে আফ্রিকার পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগ প্রদানের জন্য প্রচারণা শুরু করেছে।

ICT সম্পর্কে গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও, শিখনের ওপর এর যে গভীর প্রভাব তা দেখার জন্য বিশেষ করে উন্নয়নশীলদেশ গুলোতে গবেষণার স্বল্পতা এবং এর প্রতি মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিভিন্ন দেশের গবেষণার দেখা যায় যে, শ্রেণীকক্ষে ICT-কে সফলভাবে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা নির্ভর করে শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোর চাহিদার বিষয়গুলোকে ঘিরে।

কঠিন পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা

যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অস্ত্রের সংঘাত কিছুটা কমে এসেছে, বেশির ভাগ যুদ্ধই সংঘটিত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে নাগরিক সমাজই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। মানবাধিকার লংঘনের একটি বিশেষ দিক হলো অস্ত্রের দলে শিশুদেরকে নিযুক্ত করা ঃ প্রায় ২৫০,০০০ শিশুকে শিশু সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ সুদানের মত (বক্স ৩.৪) বিশেষভাবে নকশাকৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু সৈনিকদেরকে তাদের নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সমূহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ/শক্তিশালী বার্তা প্রেরণ করে। উদাহরণস্বরূপ উগান্ডাতে, ১৯৯০ সালের প্রথম যুদ্ধ পরবর্তী ইলেকশন প্রচারনায় শাসকগোষ্ঠী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতন মওকুফ করার ঘোষনা দেন, যা শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক হয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর উন্নয়ন করা প্রয়োজন, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রায়ই দক্ষ শ্রমিকের অভাব ঘটে। আফগানিস্তানের ন্যায় বিকল্প পদ্ধতির বিদ্যালয়ও ভূমিকা রাখতে পারে। ২০০১ সালে তালেবান সরকারের পতনের পর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কমিউনিটি এবং বাড়িভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হয়, যা একটি যুদ্ধবিধ্যস্ত সমাজকে পুনর্বাসনে সাহায্য করছে। কম দূরত্বে বিদ্যালয়, একটি নিরাপদ শিখন পরিবেশ এবং স্থানীয়ভাবে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ মেয়েদের ভর্তি হতে উৎসাহিত করেছে।

যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সমূহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ/শক্তি শালী বার্তা প্রেরণ করে।

বক্স ৩.৪: দক্ষিণ সুদানে শিশু সৈন্যদের জন্য শিক্ষা

যুদ্ধের সময় দক্ষিণ সুদানে যুদ্ধদলের সাথে সংযুক্ত শিশুদের অস্ত্রমুক্ত করার এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেয়ার (CARE) Miith Akolda শিক্ষাক্রম তৈরি করে। সম্মুখলাইনে যুদ্ধ জোন থেকে কিছু দূরে ট্রানজিট ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল। শ্রেণীকক্ষের বাইরে যে সকল কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হতো সেগুলো হলো সমস্যা সমাধান, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গান এবং নাচ, শিশু অধিকার, গল্প বলা, খেলাধুলা এবং শারীরিক শিক্ষা। যেহেতু শিশুরা অনেক ঘণ্টা শিখনের সাথে মানিয়ে চলতে পারতো না, সে জন্য এটাকে নমনীয় করা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে ক্যাম্পের জীবনের সাথে শিশুরা অভ্যস্ত হলে তাদের জন্য বিদ্যালয়ের সময় বৃদ্ধি করা হতো এবং নিয়মিত শিখন কাজের মধ্যে ছিল ধোয়া-মোছা, খাদ্য-তৈরি, কাঠ এবং পানি সংগ্রহ এবং কাপড় ধোয়া। ফলে শিশুরা ক্যাম্পের দায়িত্ব নেয় এবং নিয়মমাফিক কাজের মাধ্যমে তাদের জীবন স্থিতিশীলতায় ফিরে আসে এবং ধীরে ধীরে তারা সমন্বিত উপায়ে লেখাপড়া শেখে।

যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য প্রচারনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে- বিদ্যালয়কে পৃথকীকরণ, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার ব্যবহার বর্জন, পাঠ্যবইয়ে নেতিবাচক উপস্থাপন-এসবের ফলে শিক্ষা সহিংসতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। শান্তি শিক্ষা এবং বহুবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়ক শিক্ষা বিভিন্ন দলের মধ্যে হিংসা, হানাহানি, অবিশ্বাস ইত্যাদি দূরীকরণে শিক্ষা সহায়তা করতে পারে এবং এগুলো যুবদের জন্য হাতিয়ার হতে পারে, যার সাহায্যে তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে, এবং যোগাযোগের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় বের করা যেতে পারে।

শিক্ষা ব্যয়: আর্থিক চাহিদা অনুসারে আঞ্চলিক বৃদ্ধি

বিদ্যালয়ের ব্যয়: দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য এখনও অনেক বেশি

মৌলিক শিক্ষা: ঋণমুক্ত ত্রানের পদক্ষেপ থেকে নিস্কৃতি

অধ্যায় ৪: সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে অর্থায়ণের অগ্রগতি

দাতাগোষ্ঠী: প্রাথমিক পরবর্তী পর্যায়সমূহে অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি দেয়

মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য : ২০০৪ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে বৃদ্ধি, কিন্তু ২০০৫ সালে হ্রাস

সহায়তার ক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে খাতের দিকে পরিবর্তন : উন্নত সমন্বয়

ইএফএ (EFA) অর্জনের প্রধান দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়, কিন্তু অনেক দেশে বিশেষ করে দরিদ্রতম দেশগুলোর অগ্রগতি দাতাগোষ্ঠীর সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। ডাকার ফ্রেমওয়ার্কে এক ধরনের শর্ত নিহিত ঃ যদি উন্নয়নশীল দেশের সরকারগণ ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে প্রদর্শন করতে পারে যে EFA এর লক্ষ্য অর্জনকে তারা অনেক প্রাধান্য দিয়েছে এবং এর জন্য বলিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাহলে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দাতাগোষ্ঠী তাদেরকে অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে।

সাত বৎসর হলো ১৬৪টি দেশ ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অনুমোদন করেছে, রেকর্ড কী বলে ? জাতীয় অর্থনৈতিক অঙ্গীকারসহ মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যের ধারা এবং প্রচেষ্টাকে আরো কার্যকর করার জন্য কী করা যায় এ অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সরকারগণ কি মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত খরচ করছে?

বেশির ভাগ সরকার, বিশেষ করে কম উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এবং আরো লক্ষণীয়ভাবে আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে, মৌলিক শিক্ষাসহ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্য বৃদ্ধির বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছে। যাহোক, অনেক দেশ এখনও GNP-এর খুব কম অংশ এবং মোট সরকারি খরচের অল্পই শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করে।

উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে GNP-এর একটি বড় অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। এর পরে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ এবং আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলসমূহ (সারণী ৪.১)।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবর্তী দেশসমূহের মধ্যে তথাপি অনেক ভিন্নতা দেখা যায়। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের বাইরে ১০৫টি দেশের মধ্যে ২০০৫ সালে ২৬টি দেশ শিক্ষায় GNP-এর ৬% অথবা তার বেশি, এবং চব্বিশটি দেশ ৩% অথবা তারও কম খরচ করেছে। চুরাশিটি দেশের মধ্যে পঞ্চাশটি দেশে সার্বিকভাবে ১৯৯৯ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে শিক্ষাখাতে GNP-এর ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উভয় বৎসরের জন্য তথ্য রয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে, দক্ষিণ এশিয়া এবং প্যাসিফিকে এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া এবং আরব দেশসমূহে এই খরচের পরিমাণ যত সংখ্যক দেশে বৃদ্ধি পায় প্রায় তত সংখ্যক দেশে তা কমে যায় (যথাক্রমে সর্বমোট তেইশ এবং ঊনিশ)। যাহোক, আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে চব্বিশটি দেশের মধ্যে আঠারোটি দেশে খরচের এই অংশ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাখাতে GNP-এর অংশের খরচ, অনেকগুলো উপাদানের ফল, যার মধ্যে সরকারের নিজ দেশের রেভিনিউ সংগ্রহ করার সামর্থ্যও অন্তর্ভুক্ত। তুলনামূলকভাবে কম খরচ দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় না যে, সরকার শিক্ষাকে কম অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এটা ছোট সরকারি সেক্টরের জন্য একটি সংকেত হতে পারে।

বেশির ভাগ সরকার বিশেষ করে কম উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্য বৃদ্ধির বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছে।

সারণী ৪.১: GNP-এর % হিসাবে শিক্ষাখাতে মোট সরকারি ব্যয় এবং মোট সরকারি ব্যয়ের % হিসেবে শিক্ষাখাতে ব্যয় (মিডিয়ান) ২০০৫।

আফিকার সাব-সাহারান অঞ্চল	আরব দেশসমূহ	মধ্য এশিয়া	পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চল	দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া	ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান	উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ	মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপ
GNP-এর % হিসেবে শিক্ষাখাতে মোট সরকারি ব্যয়							
৫.০	৪.৫	৩.২	৪.৭	৩.৬	৫.০	৫.৭	৪.৯
মোট সরকারি খরচের % হিসেবে শিক্ষাখাতে মোট সরকারি ব্যয়							
১৭.৫	২৫.৭	১৮.০	১৫.০	১৪.৬	১৩.৪	১২.৭	১২.৮

উৎস: পূর্ণ EFA রিপোর্টের অধ্যায় ৪ দেখুন।

সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ এজেন্ডার মধ্যে সবচাইতে সুদৃঢ় নীতিমালার হাতিয়ার হলো প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি ব্যয়

শিক্ষাখাতে সরকারের মোট খরচের অংশ দ্বারা প্রাধান্য আরো সরাসরি পরিমাপের বিষয় হতে পারে। ৮৭টি দেশের জন্য ২০০৫ সালের তথ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য অঞ্চলের সরকারদের তুলনায় আরব দেশগুলোতে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি দেখা যায় (সারণী ৪.১)। এর পরে বেশি অংশ দেখা যায় যথাক্রমে মধ্য এশিয়ায়, এবং আফ্রিকার সাব-সাহারান, পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিক, ল্যাটিন আমেরিকা, এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে, এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি খরচের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম।

১৯৯৫ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের পরিবর্তনের তথ্য শুধুমাত্র চল্লিশটি দেশের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, যেগুলোর মধ্যে পনেরোটি দেশ ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানে। চল্লিশটির মধ্যে, আরব রাষ্ট্রের চারটির সবকটিতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার চারটির মধ্যে শুধুমাত্র দুটি দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় এবং আফ্রিকার সাব সাহারান অঞ্চলে পাঁচটির মধ্যে একটিতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে।

অনেক দেশের জন্যই সর্বমোট শিক্ষা ব্যয়ের হারের বৃদ্ধি ১৯৯৯ সাল থেকে বেশ আকর্ষণীয়। আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের চব্বিশটি দেশের তথ্যে দেখা যায় যে, এসব দেশে এক বৎসরে মিডিয়ান হার এর বৃদ্ধি ছিল ৫.৫% বা তারও কিছুটা বেশি, দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার পাঁচটি দেশের জন্য এটা ছিল ৫.১%। পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিকের (৪.৭%) ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানের (২.৪%) হার কম ছিল। মধ্য এশিয়ার প্রবৃদ্ধির হার (৮.১%) সবচাইতে বেশি ছিল।

এটা বেশ উৎসাহের ব্যাপার যে পৃথিবীর দুটো অঞ্চল (আফ্রিকার সাব সাহারান এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া) যেখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু বাস করে সেখানে শিক্ষাখাতে খরচের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সব দেশে এটা বৃদ্ধি পায়নি।

স্বল্প আয়ের দেশসমূহে প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ অনুকূলে

স্বল্প আয়ের দেশগুলো গড়ে শিক্ষাখাতের ব্যয়ের প্রায় অধিকই ব্যয় করে প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য, তুলনামূলকভাবে দেখা যায় এক্ষেত্রে মধ্যম আয়ের দেশগুলো খরচ করে ৩৮% এবং উচ্চ আয়ের দেশগুলো ২৫%। মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের দেশগুলোর সাথে তুলনামূলকভাবে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে অংশ দেওয়া হয় তা মাঝারি ধরনের। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে বাজেট বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ১৯৯৯ এবং ২০০৫ সাল এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি খরচের অংশের যে তথ্য রয়েছে তা ঊনিশটি উন্নয়নশীল দেশে সীমিত এবং খুব মিশ্র (সাতটিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বারটিতে কমেছে)। সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ এজেন্ডার মধ্যে সবচাইতে সুদৃঢ় নীতিমালার হাতিয়ার হলো প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি ব্যয়। ইথিওপিয়ার একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৯৬ এবং ২০০০ সালের মধ্যে শিক্ষাখাতে সরকারি খরচের পরিমাণ দরিদ্রতম পরিবারের শিশুদের জন্য, এবং বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বড় দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা খাতের খরচে ভৌগোলিক বৈষম্য প্রায়ই বেশি থাকে, বিশেষ করে যে দেশগুলোতে কেন্দ্রীয় কাঠামো (Federal Structures) রয়েছে। সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে ব্রাজিল, ভারত এবং নাইজেরিয়ায়, উদাহরণস্বরূপ, অনুন্নত এবং অল্প সম্পদের অঞ্চলগুলোতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সাধারণত এসব অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্জন অনেক নিম্নতম পর্যায়ে রয়েছে।

দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য গুরুতর মাশুল

যখন কিছু সংখ্যক সরকার পরিবারগুলোর ওপর থেকে অর্থনৈতিক বোঝা হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তখন বাস্তবে দেখা যায় যে অনেক দেশেই পরিবারগুলোকে শিশুদের শিক্ষার জন্য একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খরচ করতে হয় যার ফলে দরিদ্রতমদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ সীমিত হয়ে যায়।

প্রথমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু চাঁদা দিতে হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নিম্ন আয়ের এবং মধ্য আয়ের উন্নয়নশীল এগারটি দেশের মধ্যে নয়টিতে, সারা দেশে পরিবারদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট খরচের চার ভাগের এক ভাগ বহন করতে হয়। চিলি এবং জ্যামাইকাতে পরিবারে খরচ ৪০% এরও বেশি ছাড়িয়ে যায়; এবং প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আর্জেন্টিনা, চিলি, ভারত, জ্যামাইকা এবং থাইল্যান্ডে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণভাবে, উন্নয়নশীল দেশের সরকারদের মাঝে তুলনামূলকভাবে উচ্চ শিক্ষা থেকে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় বেশি অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবণতা দেখা যায় তথাপি পরিবারগুলো প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট খরচের প্রায় ২০% খরচ বহন করে।

সাংবিধানিকভাবে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার আইন থাকলেও, বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন না কোন ধরনের চার্জ নেওয়া হয়। যেমনঃ পোষাক, জিনিসপত্র সরবরাহ, যাতায়াত, অভিভাবক সমিতিকে চাঁদা প্রদান এবং বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধার উন্নয়নের জন্য খরচ হয়। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায় যে, চুরানব্বইটি দেশের মধ্যে মাত্র ষোলটি দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে কোন খরচ লাগে না। সময় সময় এই খরচ পরিবারগুলোর আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ এর সমমূল্যের, যা দরিদ্রতম পরিবারদের জন্য বোঝাস্বরূপ। বেশির ভাগ দেশেই অবস্থাপন্নদের তুলনায় দরিদ্র জনগণ শিক্ষার জন্য তাদের সম্পদের একটা বড় অংশ ব্যয় করে। নিম্ন আয়ের পরিবারদের প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তীতেও পড়া চালানোর জন্য অর্থ যোগান দেওয়া আরো গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কয়েকটি গবেষণায় শিশুরা কেন বিদ্যালয়ে যায় না, তার উত্তরে-নিম্নে বর্ণিত কারণগুলোকে প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'অর্থের অভাব', 'অর্থনৈতিক সমস্যা', 'কাজ করা প্রয়োজন', পরিবারগণ বিদ্যালয়ের খরচ মেটাতে পারে না। উগান্ডায়, ৭১% শিশুদের ওপর জরিপে দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফিস মওকুফের পূর্বে তারা কেন ঝরে পড়েছিল এর কারণ হিসেবে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির মূল্যকে তারা উল্লেখ করে।

এ সকল মূলের প্রভাবে অবস্থার অবনতি ঘটে, অনেক পরিবারই শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠায় না। তারা শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোকে এতটা গুরুত্ব প্রদান করে না, অথবা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেছে যে একই পরিবারেই শিশুদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েরা এবং একটু বেশি বয়সের শিশুরা অসুবিধার মধ্যে থাকে।

EFA-এর জন্য বাইরের সাহায্য

২০০০ সালের ডাকার সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল UPE এর আন্দোলনকে এবং মৌলিক শিক্ষাকে গতিশীল করা, এবং দাতাগোষ্ঠীর সহায়তাকে বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত করা। এর পরবর্তী বৎসরগুলোতে শিক্ষায় সরকারি উন্নয়ন সহায়তা/সাহায্য (ODA) দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে ১০.৭ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলারে পৌঁছে যেখানে ২০০০ সালে এর পরিমাণ ছিল ৬.৫ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার। সত্যিকার অর্থে বৃদ্ধি ছিল ৬৫% (চিত্র ৪.১ দেখুন)। যাহোক, ২০০৫ সালে এই সাহায্য আবার ইউ.এস.ডলার ২ বিলিয়নে নেমে আসে, যা শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারকে প্রায় ২০০২ সালের পর্যায়ে পিছিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষাখাতে যে সাহায্য বরাদ্দ দেয়া হয় তা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রায় ১৩% এবং নিম্ন আয়ের দেশসমূহের জন্য ১৬% এ স্থিতিশীল হয়।

সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে ২০০০ এবং ২০০৪ এর মধ্যে মৌলিক শিক্ষায় সাহায্যের পরিমাণ উচ্চ হারে (৯০% পর্যন্ত) বৃদ্ধি পেয়ে ২.৭ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার থেকে ৫.১ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু ২০০৫ সালে এর পরিমাণ ২৭% কমে যায়। এ হ্রাসের কারণ পরিমাপ করা দূরূহ, কারণ এটা হতে পারে সাহায্যের অঙ্গীকারের প্রতি দাতাগোষ্ঠীর সাধারণ খামখেয়ালীপনা অথবা শিক্ষার প্রতি দাতাগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার সত্যিকারের পরিবর্তন। ২০০৪ সালে কয়েকটি বড় দাতাগোষ্ঠী শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণ সাহায্যের অঙ্গীকার করে এবং বিশেষ করে এটা হয় অনেকগুলো বড় দেশে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে।

সাহায্য থেকে প্রাপ্য অর্থ বিতরণের মাধ্যমে বোঝা যায় যে গ্রহীতা দেশসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থায় ODA এর অর্থ সম্পদের কতটুকু হস্তান্তর করা হয়েছে এবং কতটুকু ব্যয় হয়েছে। সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ২০০৫ সালে ৬.৭ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার হয়, যা ২০০২ সালে ৪.৪ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার ছিল (বৎসরে ১১% বৃদ্ধি পায়)। মৌলিক শিক্ষায় ক্ষেত্রে ২০০৪ এবং ২০০৫ উভয় সালেই এর পরিমাণ ছিল ২.৮ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার। এ অঙ্গীকারের পরিমাণ ২০০৫ সালে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে যাওয়ার কারণে অর্থ বিতরণের পরিমাণ একই থাকার সম্ভাবনা অথবা পরবর্তী কয়েক বৎসরে তা আরো হ্রাস পেতে পারে।

২০০৪ এবং ২০০৫ সালে বৎসরে নিম্ন আয়ের দেশগুলো গড়ে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৩.১ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার সাহায্য পায় যা ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালের ১.৮ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার থেকে বেশি।

স্বল্প আয়ের দেশগুলোর প্রতি অধিক মনোনিবেশ

১৯৯৯ সাল থেকে শিক্ষায় মোট সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিশেষ করে স্বল্প আয়ের দেশগুলো বেশি উপকৃত হয়। এসব দেশে শিক্ষায় সাহায্যের পরিমাণ ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে বৎসরে গড়ে ৩.৫ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে ৫.৩ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার হয়। শিক্ষায় সর্বমোট সাহায্যের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০% থেকে ৫৬% এ উন্নীত হয়। মৌলিক শিক্ষায় সাহায্যের পরিমানের ধারা আরো বৃদ্ধি করার কথা উচ্চারিত হয়। ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে বৎসরের নিম্ন আয়ের দেশগুলো গড়ে ৩.১ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার সাহয্য পায় যা মৌলিক শিক্ষায় ক্ষেত্রে সকল উন্নয়নশীল দেশে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এবং ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালের ১.৮ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার থেকে বেশি।

শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকজন বৃহত্তর দাতা, শিক্ষাখাতে তাদের সাহায্যের তিনভাগের এক ভাগ মৌলিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করে।

২০০০ সাল থেকে শিক্ষায় আঞ্চলিক সাহায্যের বরাদ্দের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। যখন শিক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আফ্রিকার সাব সাহারান দেশগুলো অনেক বড় ধরনের অর্থ সাহায্য পায়, তখন দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় শিক্ষার জন্য তা ১২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০% হয়, এবং মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১% হয়।

এর অর্থ এই নয় যে, মৌলিক শিক্ষায় সাহায্যের ক্ষেত্রে দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে সবচাইতে দরিদ্র যারা তাদেরকেই লক্ষ্য করা হয়। দুটো সাধারণ তুলনামূলক চিত্র থেকে দেখা যায় যে এটা এরকম নয়। যে সকল দেশে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা অনেক বেশি (উদাহরণস্বরূপ, বুরুন্ডি, চাঁদ, আইভরি কোস্ট, মালি এবং নাইজার), সেসব দেশে মৌলিক শিক্ষার সাহায্যের ক্ষেত্রে শিশু প্রতি তুলনামূলকভাবে কম সাহায্য পেয়ে থাকে।

আবার যেখানে অনেক বেশি আয়ের দেশ মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য অনেক বেশি অর্থ সাহায্য পায় সেখানে অনেক দরিদ্র দেশ তুলনামূলকভাবে অনেক কম সাহায্য পায়। পঁয়ত্রিশটি দরিদ্র রাষ্ট্র ২০০৫ সালে সার্বিক মৌলিক শিক্ষায় প্রদত্ত সাহায্যের ১৪% পেয়েছিল, যা ১৯৯৯ সালে প্রাপ্ত সাহায্যের সমান।

২০০৪ এবং ২০০৫ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে পনেরোটি দেশ সবচাইতে বেশি সাহায্য পায়, চারটি দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশ (আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান) পায় ১৭%, এবং পাঁচটি আফ্রিকার সাব-সাহারান দেশ (বুরকিনা ফাসো, মোজাম্বিক, সেনেগাল, উগান্ডা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী তাঞ্জানিয়া) পায় ১০%। মৌলিক শিক্ষায় সবচাইতে বেশি সাহায্যপ্রাপ্ত চারটি দেশ হলো দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় এবং ২০০৪-২০০৫ সালে মৌলিক শিক্ষায় বরাদ্দের মধ্যে ভারত একাই মোট বরাদ্দের ১১% পায়। দশটি সর্বোচ্চ গ্রহীতা দেশের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ১৯৯৯ থেকে শিক্ষায় সার্বিক সাহায্যের অংশ হিসাবে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য বেড়েছে।

শিক্ষার জন্য দাতাগোষ্ঠীর কৌশল

সার্বিক সাহায্যে শিক্ষার জন্য যে অগ্রাধিকার রয়েছে তাতে দ্বিপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ২০০৪-২০০৫ সালে শিক্ষাখাতে সবচাইতে বড় বিনিয়োগকারী দেশ ছিল ফ্রান্স। যে দেশ সেক্টরগুলোর জন্য প্রতি বৎসর ১.৫ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার বা সার্বিক সাহায্যের ৪০% দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল।

পরবর্তী সর্ববৃহৎ দাতা দেশগুলো ছিল জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র। শিক্ষায় বৎসরে গড়ে এদের সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ বিলিয়ন এবং ০.৭ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার। যাহোক, এটার পরিমাণ তাদের সার্বিক সাহায্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাপানের বরাদ্দ ১২% (যা ১৯৯৯ থেকে ৫% বেশি) এবং যুক্তরাষ্ট্রের বরাদ্দ ৪% এর কম। বহুপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এসোসিয়েশন (আই.ডি.এ) এবং ইউরোপীয়ান কমিশনের বিনিয়োগ ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে ছিল সবচাইতে বেশি (যথাক্রমে বৎসরে ১.৪ বিলিয়ন এবং ০.৮ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলার)।

মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক দাতাদের কৌশল একেবারেই ভিন্ন ছিল। কয়েকটি দেশ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষাকে সবচাইতে বেশি প্রাধান্য

চিত্র ৪.১: শিক্ষায় এবং মৌলিক শিক্ষায় সার্বিক সাহায্যের অঙ্গীকার, ১৯৯৯-২০০৫

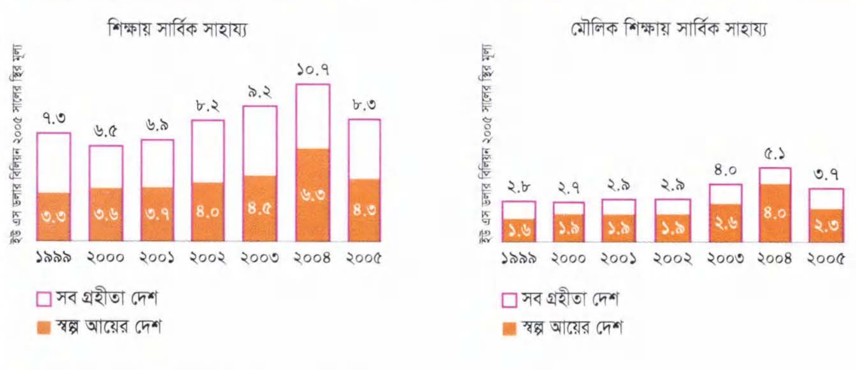

উৎস: পূর্ণ EFA রিপোর্টের অধ্যায় ৪ দেখুন।

দেয় এবং শিক্ষার সাহায্যের অর্ধেকেরও বেশি এ খাতে প্রদান করে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বৃহৎ দাতা দেশ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, এবং জাপান এগুলো মৌলিক শিক্ষারক্ষেত্রে শিক্ষা সাহায্যের তিনভাগের এক ভাগেরও কম সাহায্য দেয় (৪.২ নং সারণী দেখুন)।

এসব দাতাদেশ শিক্ষা সাহায্যের একটা বড় অংশ মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ের জন্য বরাদ্দ করে। এটা আরো সুস্পষ্ট যে দাতা দেশগুলো শিক্ষা সাহায্যের অতি সামান্য একটা অংশ প্রাক-প্রাথমিক এবং বয়স্ক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করে।

২০০৪ এবং ২০০৫ সালে গড়ে, বহুপাক্ষিক দাতাদেশসমূহ তাদের সার্বিক শিক্ষা সাহায্যের ৫৩% সাহায্য মৌলিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ দেয়, যেখানে দ্বিপাক্ষিক দাতাদেশসমূহের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৩%। যা হোক, ১৯৯৯-২০০০ সালে দ্বিপাক্ষিক সাহায্য আট শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। দ্রুতলয়ে উদ্যোগের উদ্দীপক তহবিল, (যে সকল দেশে সীমিত দাতাদেশ সাহায্য করে), মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সবটুকুই বরাদ্দ দেয়। ২০০৭ সালের জুন মাসের শেষে, ২০০৩-২০০৭ সালের জন্য দাতাগোষ্ঠী সর্বমোট ৯৩০ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার সাহায্যের জন্য অঙ্গীকার করে এবং ১৩০ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার আঠারোটি দেশে বণ্টন করা হয়েছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি অনুদান যারা প্রদান করে, ২০০৫ সালে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সাহায্যের পরিমাণ

সারণী ৪.২: গড়ে শিক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষায় দাতাগোষ্ঠীর বরাদ্দ ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০৪-২০০৫।

	শিক্ষায় সার্বিক সাহায্য		মৌলিক শিক্ষায় সার্বিক সাহায্য		সার্বিক শিক্ষার অংশ হিসেবে মৌলিক শিক্ষা		ওডিএর সার্বিক সেক্টর বরাদ্দের অংশ হিসেবে মৌলিক শিক্ষা	
	১৯৯৯-২০০০ বার্ষিক গড়	২০০৪-২০০৫ বার্ষিক গড়	১৯৯৯-২০০০ বার্ষিক গড়	২০০৪-২০০৫ বার্ষিক গড়	১৯৯৯-২০০০ বার্ষিক গড়	২০০৪-২০০৫ বার্ষিক গড়	১৯৯৯-২০০০ বার্ষিক গড়	২০০৪-২০০৬ বার্ষিক গড়
	ইউ এস মিলিয়ন ডলার ২০০৫ সালের স্থির মূল্য		ইউ এস মিলিয়ন ডলার ২০০৫ সালের স্থির মূল্য		(%)	(%)	(%)	(%)
ফ্রান্স	১৫৪৮	১৫৩৭	৩৫৪	২৭৯	২৩	১৮	৯	৭
জাপান	৫১৭	১০৪৭	২১৩	২৮১	৪১	২৭	২	৩
জার্মানি	৮২৯	৭৬০	১১৯	১৪৬	১৪	১৯	৩	৩
যুক্তরাষ্ট্র	৩৫৫	৬৭২	১৯৪	৫৬৩	৫৫	৮৪	৩	৩
যুক্তরাজ্য	৪৩৫	৬৪৬	৩২০	৫৪০	৭৪	৮৪	৮	১৩
নেদারল্যান্ডস	২৭২	৫৭০	১৭৬	৩৭৫	৬৫	৬৬	১২	১৩
কানাডা	৯৫	২২৩	৪৮	১৭৩	৫১	৭৮	৬	১১
নরওয়ে	১৩৭	১৮৬	৮৫	১১৭	৬২	৬৩	৮	৯
স্পেন	২২৫	১৫৫	৬৮	৫৯	৩০	৩৮	৬	৭
বেলজিয়াম	৮৯	১৫৫	১৫	৩৫	১৭	২৩	৩	৪
ডেনমার্ক	৬৯	১৩৭	৪২	৮২	৬১	৬০	৪	৬
সুইডেন	৬৮	১২৯	৪৪	৬৬	৬৫	৫১	৫	৪
অস্ট্রেলিয়া	২৩৯	১২৭	৬৩	৫৭	২৬	৪৫	৬	৫
অষ্ট্রিয়া	১২২	৮৯	৫	৪	৪	৫	২	২
ইটালি	৫৩	৮৬	১৫	৩৯	২৯	৪৬	৩	৯
ফিনল্যান্ড	২৬	৬৬	১২	৪০	৪৪	৬১	৭	১০
আয়ারল্যান্ড	১৭	৬১	৯	৩৮	৫১	৬৩	১৪	১২
পুর্তুগাল	৩৬	৬০	৯	৮	২৬	১৪	৪	৪
নিউজিল্যান্ড	০	৫৮	০	৩১	...	৫৪	...	১৯
সুইজারল্যান্ড	৪৫	৩৫	১৯	১৬	৪৩	৪৫	৩	২
গ্রীস	০	৩০	০	৪	...	১৪	...	৩
লুক্সেমবার্গ	০	২৬	০	১২	...	৪৬	...	১১
মোট DAC	**৫১৮০**	**৬৮১২**	**১৮১১**	**২৯৪৪**	**৩৫**	**৪৩**	**৫**	**৬**
ইন্টারনেশ্যানাল ডেবলাপমেন্ট এসোসিয়েসন	৭৮৭	১৩৫৫	৪০৬	৮২২	৫২	৬১	৭	৯
ইউরোপিয়ান কমিশন	৭০৯	৭৬২	৪৫১	৩৫১	৬৪	৪৬	৭	৪
এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ফান্ড	১২৫	৩০৮	৯	৭৮	৭	২৫	১	৫
আফ্রিকান ডেভলপমেন্ট ফান্ড	৭৪	১৪১	৪৬	৫৫	৬২	৩৯	৭	৪
ইউনেসেফ	২৮	৬৪	২৮	৬৩	১০০	৯৯	১৬	১৪
ফাষ্ট ট্রেক ইনিসিয়েটিভ (এফ টি আই)	০	৪৪	০	৪৪	...	১০০	...	১০০
ইন্টার-আমেরিকান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক বিশেষ তহবিল	৫	৩৫	৩	১৫	৫০	৪২	১	৪
মোট বহুপাক্ষিক	**১৭৩৪**	**২৭০৯**	**৯৪৫**	**১৪২৮**	**৫৫**	**৫৩**	**৬**	**৬**
মোট	**৬৯১৪**	**৯৫২০**	**২৭৫৬**	**৪৩৭৩**	**৪০**	**৪৬**	**৫**	**৬**

নোট: (...) এসব নির্দেশ করে যে তথ্য পাওয়া যায়নি।
উৎস: পূর্ণ EFA রিপোর্টের অধ্যায় ৪ দেখুন।

হঠাৎ করেই নাটকীয়ভাবে কমে যায়। যুক্তরাজ্য এবং আই.ডি.এ. (IDA) যথাক্রমে তাদের অঙ্গীকারের ৭০% এবং ৮০% কমিয়ে দেয়। ২০০৫ সালে যারা বেশির ভাগ সাহায্য কমিয়ে দেয়, তারা ২০০৪ সালে বেশি বরাদ্দ দিয়েছিল, যখন ভারত এবং বাংলাদেশ মৌলিক শিক্ষায় যুক্তরাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ এবং আই.ডি.এ. (IDA) এর অর্ধেক সাহায্য পেয়েছিল। অন্যান্য দাতাগণ তাদের সাহায্য অধিক সংখ্যক দেশে প্রদান করে।

প্রতি বৎসরে মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য প্রদান করার জন্য ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয়ান কমিশনের কয়েকটি দেশ দ্বারা গঠিত একটি মূল দল রয়েছে। বাকিটুকু অন্যান্য কয়েকটি দেশে বিতরণ করা হয়। ২০০৪ সালে অল্প কয়েকটি দেশে দাতাদের বেশি পরিমাণ সাহায্য প্রদানের কারণে ২০০৫ সালে সাহায্যের বড় একটি অংশ কমে যায়। এভাবে যদি সাহায্যের পরিমাণ কমতে থাকে তবে ভবিষ্যতে এ অবস্থা বেশ গুরুতর হবে।

কয়েকটি নিম্ন আয়ের দেশে ঋণমুক্ত কার্যক্রম বেশ সুফল বয়ে এনেছে। উচ্চ ঋণের দায়ে আবদ্ধ দরিদ্র দেশসমূহের গুণগত মান বজায় রক্ষার উদ্যোগে, দেশগুলোকে অবশ্যই দারিদ্র্য কমানোর একটি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। ত্রাণের জন্য যোগ্য ত্রিশটি দেশের মধ্যে, দারিদ্র্য কমানোর কার্যক্রমে প্রদত্ত সাহায্যের জন্য ১৯৯৯ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে জিডিপি গড়ে ৬.৪% থেকে ৮.৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মালিতে ২০০১ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর গড়ে মৌলিক শিক্ষার জন্য ত্রাণের ঋণ (debt relief) থেকে জমানো অর্থের ৩৭% বরাদ্দ করা হয়েছিল। ফলে, এ সময়কালে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১৫% খরচ বৃদ্ধি পায়।

ইন্দোনেশিয়ায় একটি মাল্টিগ্রেড স্কুলে শিক্ষকের সামনে একটি ছোট্ট মেয়ে অঙ্ক করছে।

আরো কার্যকরভাবে সাহায্য বিতরণ

আটষট্টিটি স্বল্প উন্নয়নশীল দেশের বিশটিতে ২০০৩ এবং ২০০৫ এর মধ্যে কমপক্ষে আটটি প্রধান দাতাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান করেছিল, এবং ঐ সকল স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে দশটি দেশের জন্য কমপক্ষে বারটি দাতা দেশ ছিল। সাহায্যের প্রভাবকে অধিক কার্যকর করার জন্য ২০০০ সাল থেকে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দাতাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, দাতাগোষ্ঠী এবং সরকারের জরুরি বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন যা সাহায্যের প্রভাবকে ত্বরান্বিত করেছে। নির্দিষ্ট প্রকল্পের তুলনায় সার্বিক শিক্ষায় নিয়োজিত কার্যক্রমকে সাহায্য প্রদানে অনেক দাতাদের মধ্যে সহায়তা বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ছে। যখন উন্নয়নশীল এজেন্সীসমূহ তাদের নিজস্ব প্রকল্পগুলো নিয়ে "একলা চলার" মনোভাব পোষণ করে, তখন এ ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রহীতা দেশসমূহের মধ্যে বিনিময় মূল্য কমানো সম্ভব।

সাহায্যের কার্যকারিতার ওপর ২০০৫ সালে প্যারিস ঘোষণায় ১০৭টি দেশ এবং ২৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের স্বাক্ষরের মাধ্যমে দাতাদের মধ্যে উন্নত সহযোগিতা লাভ আরো গতিশীল হয়। এর মাধ্যমে সাহায্যের কার্যকারিতার পাঁচটি প্রধান মতবাদের (tencts) উন্নত অনুশীলনের জন্য উন্নয়ন সূচক এবং টার্গেট প্রবর্তন করে: মালিকানা, সমন্বয়, সমতা (alignment), ফলাফল এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতা। EFA দ্রুতলয়ে উন্নয়নের উদ্যোগের প্রধান কেন্দ্র হলো এই নীতিমালাগুলো, যা স্থানীয় দাতা দলের দ্বারা শিক্ষা শাখা পরিকল্পনার অনুমোদন এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করে।

প্যারিস ঘোষণায় শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় যে, ২০১০ সালের মধ্যে ৬৬% সাহায্য বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদান করা হবে প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে নয়। ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০৪-২০০৫ সালে সমগ্র দেশে সার্বিকভাবে শিক্ষা সেক্টরে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৬% থেকে ১৮% এ উন্নীত করা হয়। অন্যদিকে প্রকল্পগুলোর অংশ প্রায় ১১% থেকে ১২% এ স্থির থাকে (সার্বিক সাহায্যের বেশির ভাগ আসে প্রযুক্তিগত সহায়তা থেকে যেখানে মাধ্যমিক স্কলারশীপও অন্তর্ভুক্ত)। মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো বেশি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও ঘটেছিল : সেক্টর কার্যক্রমের সহায়তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০% থেকে ৩৪% হয় এবং প্রকল্প সহায়তা হ্রাস পেয়ে ২০% থেকে ১৩% এ নেমে আসে। দরিদ্র দেশগুলোর অবস্থা আরও প্রকট। কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে এবং সুইডেন এদের প্রত্যেকটি দেশ ২০০৪-২০০৫ সালে শিক্ষায় সেক্টর সহায়তা হিসেবে ৪০% এরও বেশি দিয়েছে। সেক্টর অনুযায়ী কাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্য প্রয়োজন কিছু নির্দিষ্ট শর্তাবলীর। সংস্কারের দায় দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে এর পাশে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। গ্রহীতা দেশগুলোতে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত সামর্থ্যের জন্য প্রয়োজন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং কার্যকরভাবে এটা চালিয়ে যাওয়া।

যে সকল দেশ সাহায্য পাচ্ছে সে ক্ষেত্রে সাহায্য বিতরণ এর কার্য পরিচালনার নতুন কৌশল কীভাবে কাজ করছে? তাঞ্জানিয়ার যুক্ত প্রজাতন্ত্রে ১৪টি দাতাদেশ মোট সাহায্যের ৫০% সরাসরিভাবে বাজেটকে সহায়তা করার জন্য দিয়ে দেয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে খরচ অনেক বেশি। ২০০৪ সালেও এই দেশটিতে ১১০টি বাইরের সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প ছিল গড়ে যার পরিমাণ ছিল ১ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার এর কম। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল্যায়নে দেখা যায়, দশটি দাতার সাহায্যপ্রাপ্ত হলেও, সরকার এবং দাতাদের মধ্যে সমন্বয়ের বেশ অভাব রয়েছে। এছাড়া সাহায্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে দাতাগণ মূলত সরকারের ওপরেই প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার চাপিয়ে দেয়। অনেক দেশের জরিপেও দেখা যায়, সরকার এবং দাতাদের মধ্যে নীতিমালার যে সংলাপ হয়, তাতেও মানসম্মত শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনার বেশ অভাব থাকে।

অনেক দাতা তাদের মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগতমান পরিমাপ করেছে। ১৯৯০ এবং ২০০৫ এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তার মূল্যায়ণে দেখা যায় যে, যে সকল দেশ বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত দেশ প্রকল্পগুলোর সহায়তা পেয়েছে, তাদের ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ঝরে পড়া রোধে এবং শিখনফল উন্নয়নে প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা কম। মূল্যায়ন করে দেখা গিয়েছে যে ৭০০টি মধ্যে মাত্র ৬০% প্রকল্প টেকসই। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থায়নে বত্রিশটি শিক্ষা প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাদের বেশির ভাগ সাফল্য অর্জন করেছে।

২০০০ সাল থেকে ইএফএ এর প্রতি অর্থায়নের চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এর জন্য জাতীয় সরকার এবং দাতা উভয়ের জোরদার অঙ্গীকার রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেও অনেক ভিন্নতা দেখা যায়। কয়েকটি দেশে সরকার এবং দাতাগোষ্ঠী একসঙ্গে কার্য করার নতুন এবং অধিক ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, অপরদিকে অন্যদের ক্ষেত্রে এখনও এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।

সাহায্যের প্রভাবকে অধিক কার্যকর করার জন্য ২০০০ সাল থেকে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দাতাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, দাতাগোষ্ঠী এবং সরকারের জরুরি বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন যা সাহায্যের প্রভাবকে ত্বরান্বিত করেছে।

অধ্যায় ৫: আগামীর পথে

ইয়েমেনের বস্তি এলাকায় অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ের টিফিনের সময়

ডাকার এবং ২০১৫ সাল এর মধ্যবর্তী সময়ের পর থেকে যদি আমরা অগ্রসর হই, তবে কতকগুলো প্রধান প্রশ্নের সম্মুখীন হই। ইএফএ-এর লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা কতটুকু, প্রতি পর্যায়ের অন্যান্য কর্মীরা কীভাবে সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টাকে আরো গতিশীল করতে পারে?

প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ দেশসমূহের জন্য প্রক্ষেপনে (projection) দেখা যায় যে আরো ত্বরান্বিত গতি ছাড়াইঃ

- ৮৬টি দেশের মধ্যে, ৫৮টি দেশ যারা এখন পর্যন্ত ইউ.পি.ই অর্জন করতে পারেনি তারা ২০১৫ সালের মধ্যেও তা করতে পারবে না।
- ১০১টি দেশের মধ্যে ৭২টি দেশ ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা কমিয়ে অর্দ্ধেকেও আনতে পারবে না।
- ১১৩ টি দেশের মধ্যে মাত্র ১৮টি দেশ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০৫ সালে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ করতে পারেনি, তারা ২০১৫ সালের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জন করবে।

যে সকল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে সকল শিশুকে ভর্তির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে, সে সকল দেশ জিএনপি-এর অংশ হিসাবে শিক্ষার খরচ বৃদ্ধি করেছে। যে সকল দেশের অগ্রগতি ধীর সে সকল দেশের এই অংশ কমে গিয়েছে।

সারা বিশ্বে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৮ মিলিয়নেরও বেশি নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ইউপিই অর্জনের জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চল, শিক্ষকের সংখ্যা ২০০৪ সালের ২.৪ মিলিয়ন থেকে ২০১৫ সালে ৪ মিলিয়নে উন্নীত করতে হবে, এ ছাড়াও শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে যারা চলে যাবেন করবেন তাদের পরিবর্তে আরো ২.১ মিলিয়ন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে নিম্ন আয়ের দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে ইএফএ-এর জন্য সরকারি খরচ বৃদ্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, যা এশিয়া এবং আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে অনেক সরকারই শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য তাদের জাতীয় আয়ের অংশ বৃদ্ধি করে। কিন্তু সরকারগুলোকে যেমন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি খরচ করতে হয় তেমনি ইএফএ-এর ক্ষেত্রেও বেশি খরচের মোকাবেলা করতে হবে। মৌলিক শিক্ষার জন্য নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে ২০০৪-২০০৫ সালে বৎসরে গড়ে ৩.১ বিলিয়ন ইউ,এস ডলার এর সাহায্য স্পষ্টতই ইএফএ-এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রতি বৎসরের প্রয়োজনের তুলনায় (১১ বিলিয়ন ইউ,এস ডলার) অনেক কম। বেশ কয়েকটি দেশে সাফল্যজনকভাবে সাহায্যের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ একটা অংশ দেওয়া হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, মোজাম্বিক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী তাঞ্জানিয়া রয়েছে, যার থেকে বোঝা যায় যে উন্নতি করার (scaling up) সুযোগ আছে এবং তা প্রসারিত করা যায়।

যে কয়টি দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থা মৌলিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে, সেটা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কয়েকটি দাতাদেশ তাদের সাহায্যের ১০% এরও কম মৌলিক শিক্ষার জন্য দেয় (সারণী ৪.২)। সেক্টরের তিনটি সর্ববৃহৎ দাতাদের (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং জার্মানি) মধ্যে ২০০৪ সালে কেউ মৌলিক শিক্ষায় ৪% এর বেশি বরাদ্দ দেয়নি। যদি দ্বিপাক্ষিক দাতাসমূহ তাদের ২০০৫ সালের অঙ্গীকার ঠিক রাখে, সার্বিকভাবে সাহায্য বৃদ্ধি করে এবং মৌলিক শিক্ষার অংশ কমপক্ষে সার্বিক সেক্টর সাহায্যের ১০% বৃদ্ধি করে, তবে ২০১০ সালের মধ্যে মৌলিক শিক্ষায় দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের পরিমাণ ৮.৬ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার হতে পারে। মৌলিক শিক্ষায় বহুপাক্ষিক সাহায্যের সাথে এটা যুক্ত হয়ে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১০ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার হতে পারে।

মৌলিক শিক্ষায় বর্ধিত সাহায্যের বিতরণের গুরুত্ব অনেক। মৌলিক শিক্ষার ২% এরও কম সাহায্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় যায় এবং বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় যে যুবা এবং বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠি খুব কম প্রাধান্য দিয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতার ওপর তৈরী প্রক্ষেপণসমূহ ভবিষ্যতে সব দেশে ইএফ এর জন্য সাহায্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে কী ইঙ্গিত বহন করে? সার্বিকভাবে বত্রিশটি নিম্ন আয়ের দেশ যাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাত্রা অনেক কম তারা ২০০৪-২০০৫ সালে মৌলিক শিক্ষার জন্য মোট সাহায্যের তিন ভাগের এক ভাগ বরাদ্দ পেয়েছে, যা ডাকার পূর্ব অবস্থার সমান। এফটিআই (FTI) পনেরোটি দেশের পরিকল্পনা সমর্থন (endorsed) করেছে এবং ২০০৮ সালে আরো নয়টি দেশের ক্ষেত্রে এটা হবে আশা করা যায়। মূল প্রশ্ন হলো বাকি আটটি দেশের ক্ষেত্রে সাহায্যের বণ্টন কিরূপ হবে, যাদের সবাই (দুটি রাষ্ট্র ছাড়া) বেশ দুর্বল ও নাজুক। বত্রিশটি দেশের মধ্যে ছয়টি দেশ ২০০৪-২০০৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী প্রতি শিশুর জন্য মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গড় এর কম পরিমাণ সাহায্য পায় এবং চারটি দেশে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে বিদ্যালয় বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাহায্যের পরিমাণ কমেছে।

২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ১৮ মিলিয়নেরও বেশি নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন হবে।

ইএফএ অর্জনের জন্য ফলপ্রসূ এজেন্ডা

বৈশ্বিক পর্যায়ে:

- জলবায়ুর পরিবর্তন, জনগণের স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলোতে উদ্ভূত সমস্যা/ইস্যুসমূহ মোকাবেলার সাথে সাথে সকল স্টেকহোল্ডারকে ইএফএ-কে প্রাধান্য দিতে হবে, শুধু সর্বজনীন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলেই হবে না।
- নীতিমালা এবং এর প্রয়োগকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্তি, সাক্ষরতা, গুণগতমান, ধারণক্ষমতার উন্নয়ন এবং অর্থায়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- ইএফএ-এর সকল এজেন্ডার জন্য আন্তর্জাতিক স্থপতিদের আরও বেশি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় সরকারদের যা যা করতে হবে:

- ইএফএ লক্ষ্যসমূহের জন্য পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ, যদিও সকল সেবা সরকারি সেক্টরের মাধ্যমে প্রদান করা হয় না;
- উন্নত বিদ্যালয় অবকাঠামোর মাধ্যমে বেতন মওকুফ, দরিদ্রতম এবং প্রান্তিক পর্যায়ের শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা, দরিদ্রতম পরিবারদের অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা, কর্মরত শিশু এবং যুবকদের জন্য নমনীয় বিদ্যালয় ব্যবস্থা এবং প্রতিবন্ধী, স্বদেশী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একীভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- জেন্ডার প্যারিটির স্থায়ীত্ব এবং জেন্ডার সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে;
- অনেক বেশি সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যুব এবং বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে;
- সাক্ষরতা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসারতা ঘটাতে হবে;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর শিখন পরিবেশ, মাতৃভাষায় শিখন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ শিখন সামগ্রীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে;
- সরকারি খরচের পরিমাণ ধরে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে বৃদ্ধি করতে হবে;
- সরকারি সকল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার ক্ষমতার উন্নয়ন করতে হবে;
- নীতিমালা প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং পরিবীক্ষণে (মনিটরিং) সুশীল সমাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সুশীল সমাজের কাজ হবে:

- সংস্থাসমূহকে জোরদারকরণ যার মাধ্যমে নাগরিকগণ ইএফএ এর জন্য পরামর্শ প্রদান করতে পারবে এবং সরকার এবং আন্তর্জাতিক সমাজ জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে;
- শিক্ষা নীতিমালার উন্নয়ন, প্রয়োগ এবং পরিবীক্ষণ এর ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের নিয়মিত এবং সময়মত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষা নীতিমালার বিশ্লেষণ এবং অর্থায়নে সুশীল সমাজ (CSO) সদস্যদের প্রশিক্ষণে উৎসাহ প্রদান।

দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক এজেন্সীসমূহের কাজ হবে:

- মৌলিক শিক্ষায় তারা যে সাহায্য প্রদান করে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, এবং তা বিভিন্নভাবে কাজে প্রয়োগ করা;
- মৌলিক শিক্ষায় কমপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সেক্টরাল সাহায্যের ১০% বৃদ্ধি এবং মৌলিক শিক্ষায় বহুপাক্ষিক সাহায্য বৃদ্ধি করা;
- দীর্ঘ মেয়াদী অঙ্গীকার করা যাতে অর্থমন্ত্রীরা প্রধান পলিসির প্রচেষ্টাগুলোকে সমর্থন যোগাতে পারে;
- সাব সাহারান আফ্রিকা এবং নাজুক পরিস্থিতির রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা;
- প্রাক-শৈশবকালীন শিশু কার্যক্রম, সাক্ষরতা, যুবক ও বয়স্কদের জন্য অন্যান্য কার্যক্রম এবং ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য আরো অর্থ বরাদ্দ করা;
- দেশগুলোর সেক্টর পরিকল্পনার জন্য ক্রমাগত সাহায্য প্রদানের প্রচেষ্টা চালানো।

ডাকার এর সময় থেকে সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে : দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জাতীয় সরকারগণ সব অঞ্চলে সফলতা অর্জন করেছে, এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাহায্য এক্ষেত্রে উন্নয়নে সহায়তা করেছে। যদি সকল বয়সীদের শিক্ষার অধিকার অর্জন/পূরণ করতে হয় তা হলে এখন থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত যে অল্প সময় রয়েছে তার মধ্যে এ প্রচেষ্টা এবং গতিকে ধরে রাখতে হবে এবং বৃদ্ধিও তরান্বিত করতে হবে।

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা আমরা কি সক্ষম হব ?

এ বৎসরের *ইএফএ-এর ওপর গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট* ২০১৫ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষার প্রতি আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার মধ্যবর্তী পয়েন্টকে নির্দেশ করে। এটা প্রাক-শৈশবকালীন শিখন কার্যক্রমের প্রসারতা বা উন্নয়ন, অবৈতনিক এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি এবং জেন্ডার সমতা আনয়ন, বয়স্ক নিরক্ষরতা কমানো এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণ, এসব বিষয়ে অগ্রগতির পরিমাপ করে।

সত্যিকারভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু অর্জিত হয়েছে, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক সরকার বিদ্যালয়ের খরচ কমানোর জন্য এবং শিক্ষা গ্রহণে মেয়েদের বাধা দূরীকরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখনও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এখনও পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং শিখন সামগ্রীর অভাব রয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিশু এবং যুবকদের জন্য এখনও প্রধান বাধা হলো দারিদ্র্য এবং অসুবিধাগ্রস্ত পরিস্থিতি। বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি উভয়ের জন্য নীতিমালা রয়েছে, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খুব অল্প বয়সে অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং নাটকীয়ভাবে যুবক এবং বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রমের প্রসারণের জন্য অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন। দাতাগোষ্ঠী ২০০০ সালে যে অঙ্গীকার করেছিলেন সে অনুসারে শিক্ষার সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

এছাড়া এই সারসংক্ষেপ রিপোর্ট উদ্ভাবনমূলক প্রকল্প, কৌশলসমূহ এবং এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সাধারণ এজেন্ডাকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে তাগিদ প্রয়োজন, তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

EFA GMR EDUCATION FOR ALL GLOBAL MONITORING REPORT

www.unesco.org/publishing

কভার ফটো
ভারতের বিহার রাজ্যে
কিশোরী কেন্দ্র স্কুলে শিশুরা পড়াশুনা করছে
© আমি ভাইটাল/প্যানোজ পিকচার্স